POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ ۚ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ۭ وَاَنْتَ عَلٰي كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ

এবং আমি যতদিন তাহাদের মধ্যে ছিলাম আমি তাহাদের উপর সাক্ষী ছিলাম, কিন্তু যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দিলে তখন তুমিই তাহাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক ছিলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই সকল বিষয়ের উপর সাক্ষী।

(মায়েদা: ১১৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 47-48

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

25 শে নভেম্বর-2 রা ডিসেম্বর , 2021 ● 19-26 রবিউল সানি 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

সর্বোত্তম কাজ

১৪৮০) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে সর্বোত্তম কাজ কোনটি? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর ঈমান আনা। প্রশ্ন করা হয় এর পর কোন কাজটি? তিনি (সা.) বললেন: আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হয় যে এর পর কোন কাজটি? তিনি (স.) উত্তর দিলেন: সেই হজ্জ সম্পাদন যার ভিত্তি হল অকৃত্রিম পুণ্যের প্রেরণা এবং আনুগত্যের চেতনা।

হজ্জের গুরুত্ব

১৪৯৬) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হজ্জ করেছে, কামাবেগপূর্ণ কথা বার্তা থেকে বিরত থেকেছে এবং খোদার আদেশের অবাধ্য হয় নি, সে এমনভাবে (পবিত্র হয়ে) ফিরে আসবে, যেমনটি সে সেই দিন ছিল, যেদিন সে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবুল হজ্জ)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২২ ও ২৯শে অক্টোবর, ২০২১ ।

হযরত আবু বাকার (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সেই কারণে যা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। বস্তুতই হযরত আবু বাকার (রা.) যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.)-কে সিদ্দিক উপাধি দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌ই উত্তম জানেন যে তাঁর মধ্যে কি কি সদগুণ ছিল। তিনি এও বলেন, হযরত আবু বাকার (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব সেই কারণে যা তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। বস্তুতই হযরত আবু বাকার (রা.) যে বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন, তার দৃষ্টান্ত বিরল। সত্য এই যে, প্রত্যেক যুগে, যে ব্যক্তি সিদ্দিক-এর পরাকাষ্ঠা অর্জনের আকাঙ্খা রাখে, তার জন্য আবশ্যক হবে নিজের মধ্যে আবু বাকারের গুণাবলী ও চরিত্র তৈরী করে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং যথা সম্ভব দোয়া করা । যতক্ষণ পর্যন্ত না আবু বাকার সদৃশ গুণাবলীর ছায়ায় নিজেকে আচ্ছাদিত না করে এবং সেই রঙে নিজেকে রঙীন করে তোলে, সেই সব পরাকাষ্ঠা অর্জিত হওয়া সম্ভব নয়।

আবু বাকারের প্রকৃতি কেমন ছিল?

এই মুহূর্তে এ বিষয়ে বিশদ বির্তক এবং আলোচনার অবকাশ নেই, কেননা এর জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। সংক্ষেপে আমি একটি ঘটনা বর্ণনা করছি। আঁ হযরত (সা.) যখন নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন,তখন আবু বাকার সিদ্দিক (রা.) সিরিয়া গিয়েছিলেন। তিনি ফেরার পথেই এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়, তার কাছ থেকে তিনি মক্কার খোঁজ খবর নেন এবং সেখানকার সংবাদ জানতে চান। কেউ যখন সফর থেকে ফিরে আসে, তখন স্বদেশবাসীর সঙ্গে দেখা হলে লোকে সাধারণত দেশের খবরাখবর নেয়। সেই ব্যক্তি বলল, একটি নতুন ঘটনা ঘটেছে। তোমার বন্ধু (মহম্মদ) নবী হওয়ার দাবি করেছে। তিনি একথা শোনামাত্রই বললেন,'যদি তিনি এমন দাবি করে থাকেন তবে নিশ্চয় তিনি সত্যবাদী।' এর থেকে বোঝা যায় যে আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে তিনি কতটা সুধারণা পোষণ করতেন, নিদর্শন দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন নি। বস্তুত, যে দাবিকারক সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত থাকে না, যেখানে একাত্মতার অভাব থাকে সেই ব্যক্তিই নিজেকে আশ্বস্ত করতে নিদর্শন দেখতে চায়। কিন্তু যার কোন অভিযোগ আপত্তি নেই, তার নিদর্শনের প্রয়োজন কিসের? বস্তুত আবু বাকার সিদ্দীক লোকের মুখে শুনে পথিমধ্যেই ঈমান এনেছিলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি নবুয়তের দাবি করেছেন?' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, একথা সত্য। একথা শুনে হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার প্রথম সত্যায়নকারী। কিন্তু এটি শুধু মৌখিক দাবি ছিল না, তিনি নিজের কাজের সঙ্গে সেটির সামঞ্জস্য করে দেখিয়েছেন, এতটাই যে আমৃত্যু তিনি সেই অঙ্গীকার পালন করেছেন, মৃত্যুর পরও সঙ্গ ত্যাগ করেন নি। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৭)

জনমানসে যে জিনের অবধারণা পাওয়া যায়, তার কোনও অস্তিত্বই নেই। রসুল করীম (সা.)-এর যে জিনেরা ঈমান এনেছিল, তারা মানুষই ছিল, ভিন্ন কোন প্রাণী নয়।

সূরা জিন্ন এবং সূরা এহকাফ থেকে জানা যায় যে জিন্নদের একটি জামাত আঁ হযরত (সা.)-এর উপর ঈমান এনেছিল। হাদীস থেকেও জানা যায় যে জিনদের এক প্রতিনিধি দল রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছিল। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এ প্রসঙ্গে বলেন-

এখন প্রশ্ন হল এই যে, রসুল করীম (সা.)-এর যুগে যে জিন্নেরা ঈমান এনেছিল, তারা কি ভিন্ন কোন জীব ছিল? এ সম্পর্কে কুরআন করীম থেকে প্রমাণ হয় যে, তারা ইহুদী ছিল, কেননা, তারা মূসার কিতাব এবং তাঁর উপর ঈমান আনার কথা উল্লেখ করেছিল। কাজেই জানা গেল যে, তারা ইহুদী ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদের জিন্ন নামে উল্লেখ করেছেন, কারণ, তারা বহিরাগত ছিল আর রসুল করীম (সা.) তাদের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাতে করেছিলেন। কতিপয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, তারা নাসিবাঈন-এর অধিবাসী ছিল, যারা রাত্রিতে রসুল করীম (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল। (বুখারী কিতাবুল মানাকিব,ওয়া মুসলিম, ১ম ভাগ)। ফিরে যাওয়ার পর তাদের এবং তাদের জাতির মধ্যে যে ঘটনা ঘটেছিল তার উল্লেখ কুরআন করীমে পাওয়া যায়। জানা যায় যে আরবদের বিরোধিতার কারণে তারা গোপনে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিল এবং তাঁর কাছ থেকে কুরআন শুনেছিল। ফিরে যাওয়ার পর তাদের অন্তর সাক্ষী দিয়েছিল যে আঁ হযরত (সা.) সত্যবাদী ছিলেন। এরপর তারা নিজের জাতিতে তবলীগ করতে শুরু করে দেয়।

এ বিষয়ের প্রমাণ যে এই জিন্নগুলি মানুষই ছিল, তা নিম্নরূপ। প্রথমত, তারা গোপনে সাক্ষাত করেছিল, তারা যদি জিন্ন হত, তবে গোপনে এবং রাত্রিতে সাক্ষাতের প্রয়োজন হল কেন? প্রকাশ্যে সাক্ষাত করলে কেউ কি তাদের ক্ষতি করতে পারত? আর জিন্নদের সম্পর্কে

শেষাংশ শেষের পাতায়

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

খোদার কসম, আমি তো পছন্দ করি, আমি যেন এমনভাবে মুক্তি লাভ করি যে *'লা আলাইয়া ওয়ালা আলী'* অর্থাৎ আমি কোন পুরস্কার চাই না আর আমাকে যেন শাস্তিও দেওয়া না হয়।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত উমর (রা.) এর জীবনীর কিছু ঘটনাবলী এবং তাঁর সম্পর্কে কতিপয় সাহাবা এবং পাশ্চাত্যবিদদের অভিমত।

পাঁচজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২২ শে অক্টোবর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৫ ইখা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় আমি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের প্রেক্ষাপটে হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) এবং হযরত উসমান (রা.)-এর মধ্যকার পারস্পরিক বিতণ্ডার কথা উল্লেখ করেছিলাম। (সেই সাথে) এটিও বলেছিলাম যে, রেওয়ায়েতটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে দৃষ্টিকোণ থেকে তা কতটুকু সত্য তা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। অর্থাৎ তাদের পরস্পরের মাঝে লড়াই হয়েছিল (মর্মে কথাটির সত্যাসত্য জানা নেই)। এ সম্পর্কে আরো অনুসন্ধানের পর যে বিষয়গুলো সামনে এসেছে তা-ও বলে দিচ্ছি। একস্থানে একথারও উল্লেখ পাওয়া গেছে যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) যখন হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বিতণ্ডায় লিপ্ত হন তখনও হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের আসনে সমাসীন হন নি। আগেই বলা হয়েছে, উবায়দুল্লাহ্র সংকল্প ছিল যে, তিনি (আজ) মদিনার কোন বন্দিকেই আর জীবিত রাখবেন না। প্রাথমিক মুহাজেররা তার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে তাকে বাধা দেন এবং তাকে ধমক দেন। কিন্তু তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করব, অর্থাৎ যত কয়েদি ও দাস রয়েছে (তাদেরকে হত্যা করব) আর মুহাজেরদেরও তিনি পাত্তা দেন নি। এমনকি হযরত আমর বিন আস (রা.) তার সাথে অনবরত আলোচনা করতে থাকেন আর অবশেষে তিনি হযরত আমর বিন আস (রা.)-এর হাতে তরবারি তুলে দেন। এরপর সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) তাকে বোঝানোর জন্য তার কাছে আসেন, তখন তার সাথেও হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) ঝগড়া করেন। যেভাবে বলা হয়েছে যে, হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে বাগ্বিতণ্ডা হয় আর লোকজনও আপোস করানোর চেষ্টা করে। আরও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, যখন এই ঘটনাটি সংঘটিত হয় তখনও হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বয়আত করা হয় নি। অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.) তখনও খলীফা মনোনীত হন নি, যেভাবে ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে।

(সীরাত উমর ফারুক, প্রণেতা মহম্মদ রেজা, পৃ: ৩৪২-৩৪৩)

অনুরূপভাবে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে এরপর গ্রেফতারও করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.)-এর হাতে বয়আতের পর, অর্থাৎ খলীফার আসনে সমাসীন হওয়ার পর হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে হযরত উসমান (রা.)-এর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমীরুল মু'মিনীন মুহাজের ও আনসারদের একটি দলকে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করেন, আপনারা আমাকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে মতামত দিন, যে ইসলামের (শিক্ষা বাস্তবায়নে) পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। তখন হযরত আলী বিন আবি তালেব (রা.) বলেন, তাকে ছেড়ে দেওয়া ন্যায়পরিপন্থী কাজ হবে, আমার মতে তাকে অর্থাৎ উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.)-কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। কিন্তু কোন কোন মুহাজের এই রায়কে অসহনীয় কঠোরতা ও কড়া শাস্তি আখ্যা দেন এবং বলেন, গতকাল উমর (রা.)-কে হত্যা করা হয়েছে আর আজ তার পুত্রকে হত্যা করা হবে? এই আপত্তি উপস্থিত লোকদের দুঃখভারাক্রান্ত করে আর হযরত আলী (রা.)ও নীরব থাকেন। কিন্তু যাহোক, হযরত উসমান (রা.) চাইলেন যেন উপস্থিত লোকদের মধ্যে থেকে কেউ এই স্পর্শকাতর অবস্থা উত্তরণের জন্য কোন পথ খুঁজে বের করেন বা পরামর্শ দেন। সেই বৈঠকে হযরত আমর বিন আস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে এর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। (কেননা) এটি তখনকার ঘটনা যখন আপনি মুসলমানদের আমীর ছিলেন না আর এ ঘটনা যেহেতু আপনার খিলাফতকালে সংঘটিত হয় নি, তাই আপনার ওপর এর কোন দায়ভারও বর্তায় না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তার এই রায়ে আশ্বস্ত হতে পারেন নি, বরং তিনি (রা.) রক্তপণ দেওয়াকেই সঠিক মনে করেন। তাই তিনি (রা.) বলেন, আমি হলাম এসব নিহত লোকের অভিভাবক, তাই রক্তপণ নির্ধারণ করে আমার সম্পদ থেকে আমি তা পরিশোধ করব।

(সৈয়্যদানা হযরত উমর ফারুক আযাম,প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৮৪১-৮৪২) এটি হলো এ সম্পর্কে একটি রায়।

তাবারীর ইতিহাসের বর্ণনা অনুসারে হযরত উসমান (রা.) হযরত উবায়দুল্লাহ্ (রা.)-কে হুরমুযানের পুত্রের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যেন সে তার পিতৃহত্যার বিনিময়ে শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করে, কিন্তু তার পুত্র (তাকে) ক্ষমা করে দেয়। এর ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি সমস্যার সমাধান তুলে ধরতে গিয়ে এই প্রশ্ন উঠিয়েছেন যে, নিহত চুক্তিবদ্ধ কাফেরের বিনিময়ে মুসলমান হন্তাকে শাস্তি দেওয়া যায় কিনা?

আর তিনি (রা.) সেই ঘটনা বর্ণনা করেন যা বিগত এক জুমু আর খুতবায় আমি বর্ণনা করেছি, তথাপি বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে পুনরায় বর্ণনা করছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,তাবারীতে কুমাযবান বিন হুরমুযান তার পিতার হত্যার ঘটনা বর্ণনা করেন। হুরমুযান একজন ইরানী নেতা ও অগ্নি উপাসক ছিল এবং দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.)-এর হত্যার ষড়যন্ত্রে সে সন্দেহভাজন ছিল। এতে কোন ধরনের তদন্ত ছাড়াই উত্তেজনার বশে উবায়দুল্লাহ্ বিন উমর তাকে হত্যা করে বসেন। সেই পুত্র বলে, ইরানী লোকেরা মদিনায় পরস্পর মিলেমিশে বাস করত, যেভাবে প্রচলিত রীতি হলো ভিনদেশে যাওয়ার পর দেশপ্রেম প্রগাঢ় হয়ে যায়। একদিন ফিরোজ, অর্থাৎ যে হযরত উমরের হত্যাকারী ছিল, সে আমার পিতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছে একটি দু'ধারী খঞ্জর ছিল। (হুরমুযানের ছেলে এটি বর্ণনা করে যে,) আমার পিতা এই খঞ্জরটি নিয়ে নেয় এবং তাকে জিজ্ঞেস করে, এই দেশে এই খঞ্জর দিয়ে তুমি কী কাজ কর? অর্থাৎ এই দেশ তো শান্তিপূর্ণ দেশ, এখানে অস্ত্রের কী প্রয়োজন রয়েছে? সে বলে, আমি এটি দিয়ে উট হাঁকানোর কাজ করি। যখন তারা দুজন পরস্পর কথা বলছিল তখন কেউ তাদেরকে দেখে ফেলে আর হযরত উমর (রা.)-কে যখন হত্যা করা হয় তখন সে বলে, হুরমুযানকে আমি নিজে এই খঞ্জরটি ফিরোজকে দিতে দেখেছি। তখন হযরত উমরের ছোট ছেলে উবায়দুল্লাহ্ গিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করে ফেলেন। যখন হযরত উসমান খলীফা নির্বাচিত হন, তখন তিনি আমাকে ডেকে পাঠান এবং উবায়দুল্লাহ্কে গ্রেফতার করে আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, হে আমার পুত্র! এ হলো তোমার পিতার হত্যাকারী এবং তুমি আমাদের তুলনায় তার ওপর বেশি অধিকার রাখ। সুতরাং যাও এবং তাকে হত্যা কর। আমি তাকে ধরে নিয়ে শহরের বাইরে চলে আসি। পথিমধ্যে যার সাথেই আমার সাক্ষাৎ হতো সে আমার সাথে যোগ দিত, কিন্তু কেউই আমার সাথে লড়াই করতে আসে নি। তারা কেবল আমার নিকট এতটুকুই নিবেদন করত যে, আমি যেন তাকে ছেড়ে দিই। অতএব আমি (উপস্থিত) সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে বলি, আমার কি তাকে হত্যা করার অধিকার আছে? সকলেই উত্তর দেয়, হঁ্যা! তোমার অধিকার রয়েছে, তাকে হত্যা কর আর উবায়দু ল্লাহ্কে তারা (এই বলে) ভর্ৎসনা করতে থাকে যে, সে এমন মন্দ কাজ করেছে। এরপর আমি জিজ্ঞেস করি, তোমাদের কি আমার হাত থেকে তাকে ছাড়িয়ে নেওয়ার অধিকার আছে? তারা উত্তরে বলে, মোটেও নয় আর পুনরায় উবায়দুল্লাহ্কে (এই বলে) তিরস্কার করে যে, সে প্রমাণ ছাড়াই তার পিতাকে হত্যা করেছে। এ অবস্থায় আমি খোদা তা'লা এবং সেসব লোকের খাতিরে তাকে মুক্ত করে দেই আর মুসলমানরা আনন্দের আতিশয্যে আমাকে তাদের কাঁধে তুলে নেয়। খোদার কসম! আমি লোকজনের মাথা ও কাঁধে (আরোহিত অবস্থায়) আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছি আর তারা আমাকে মাটিতে পা পর্যন্ত রাখতে দেয় নি। এই রেওয়ায়েত থেকে সাব্যস্ত হয়, সাহাবীদের কর্মপন্থাও এটিই ছিল যে, তারা অ-মুসলিমের মুসলিম হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন আর এটিও সাব্যস্ত হয় যে, কেউ যে অস্ত্র দিয়েই নিহত হোক না কেন তাকে (অর্থাৎ হত্যাকারীকে) হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে এটিও প্রমাণিত হয় যে, হত্যাকারীকে গ্রেফতার করা ও তাকে শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপরই বর্তায়, কেননা এই রেওয়ায়েত থেকে প্রতীয়মান হয়, উবায়দুল্লাহ্ বিন উমরকে গ্রেফতারও হযরত উসমান (রা.)-ই করেন এবং তিনিই তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য হুরমুযানের পুত্রের হাতে তুলে দেন। হুরমুযানের কোন বংশধর তার বিরুদ্ধে মামলাও করে নি

আর গ্রেফতারও করে নি।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এখানে এই সন্দেহের নিরসনও আবশ্যক যে, হন্তাকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে কি নিহত ব্যক্তির বংশধরদের হাতে তুলে দেয়া উচিত, যেমনটি হযরত উসমান করেছিলেন, নাকি স্বয়ং রাষ্ট্রেরই শাস্তি প্রদান করা উচিত? অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এটি একটি আপেক্ষিক বিষয়, তাই ইসলাম এটিকে যুগের দাবির ওপর ছেড়ে দিয়েছে। জাতি তাদের স্বীয় সমাজ ব্যবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী যে পন্থাকে অধিক কল্যাণজনক মনে করে তা অবলম্বন করতে পারে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এ দুটি পন্থাই বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে লাভজনক হয়ে থাকে।(তফসীরে কবীর, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৫৯-৩৬১)

এ ব্যাখ্যার পর এখন আমি হযরত উমর (রা.)-এর আরো কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি। মৃত্যুর সময় হযরত উমর (রা.)-এর কাকুতিমিনতি, বিনয় ও নম্রতার চিত্র সম্পর্কে তার পুত্র বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর পুত্রকে বলেন, আমার কাফনে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র নিকট যদি আমার জন্য কল্যাণ থাকে তাহলে তিনি আমাকে এর চেয়ে উত্তম পোশাক দান করবেন। কিন্তু যদি আমি সেটির যোগ্য না হই তবে আমার কাছ থেকে তা ছিনিয়ে নিবেন এবং সেটি খুব দ্রুত করবেন। এছাড়া আমার কবরের ব্যাপারেও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে। আল্লাহ্‌র সমীপে যদি আমার জন্য এতে কল্যাণ থাকে তবে এটিকে আমার দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত করে দেবেন। কিন্তু আমি যদি এর ব্যতিক্রম হই তবে এটিকে আমার জন্য এতটা সংকীর্ণ করে দিবেন যে, আমার পাঁজরের হাড় ভেঙে যাবে। আমার জানাযার সাথে কোন নারীকে নিয়ে যাবে না। আমার এমন কোন প্রশংসা করবে না যা আমার মাঝে নেই, কেননা আল্লাহ্ আমাকে অধিক জানেন। আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় দ্রুত হাঁটবে। আল্লাহ্‌র কাছে যদি আমার জন্য কল্যাণ থাকে তবে তোমরা আমাকে সেই জিনিসের দিকে পাঠাচ্ছ যা আমার জন্য অধিক উত্তম, কিন্তু যদি তেমনটি না হয় তবে তোমরা তোমাদের কাঁধ থেকে এই অনিষ্টকে অপসারণ করবে যা তোমরা বহন করছ। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৩)

এছাড়া এটিও উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হযরত উমর (রা.) ওসীয়্যত করেছিলেন, আমাকে কস্তুরী প্রভৃতি দিয়ে গোসল দেবে না। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৯)

হযরত উসমান বিন আফ্‌ফান (রা.) থেকে বর্ণিত, আমি হযরত উমরের কাছে যাই যখন তার মাথা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরের উরুতে রাখা ছিল। হযরত উমর (রা.) তাকে, অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমরকে বলেন, আমার গাল মাটিতে রেখে দাও। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আমার উরু এবং মাটি একই সমতলে রয়েছে, অর্থাৎ এতে আর কতটুকুই-বা ব্যবধান রয়েছে! হযরত উমর (রা.) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার বলেন, তোমার মঙ্গল হোক! আমার মাথা মাটিতে রেখে দাও। এরপর হযরত উমর (রা.) নিজের দুই পা একত্রিত করেন। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর আমি হযরত উমর (রা.)-কে (একথা) বলতে শুনি যে, আমি এবং আমার মায়ের ধ্বংস, যদি আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা না করেন, এ অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৪-২৭৫)

হযরত সিমাক হানাফী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বলতে শুনেছি, আমি হযরত উমরকে বললাম, আল্লাহ্ আপনার মাধ্যমে নতুন শহর আবাদ করেছেন, আপনার মাধ্যমে অনেক বিজয় অর্জিত হয়েছে এবং আপনার মাধ্যমে অমুক অমুক কাজ হয়েছে। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার তো আকাঙ্ক্ষা হলো এ থেকে আমি যেন সে ভাবে মুক্তি লাভ করি যেন আমার জন্য কোন পুরস্কারও না থাকে আর কোন বোঝাও না থাকে।

অর্থাৎ এর জন্য গর্বের কিছু নেই যে, আমি বড় বড় কাজ করেছি এবং আমার যুগে বড় বড় বিজয় অর্জিত হয়েছে, বরং আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতির প্রাধান্য ছিল এবং পরকালের চিন্তা ছিল। যায়েদ বিন আসলাম তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত উমরের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তখন তিনি বলেন, তোমরা আমার প্রতি ইমারত সম্পর্কে সন্দেহ করে থাক, কিন্তু খোদার কসম, আমি তো পছন্দ করি, আমি যেন এমনভাবে মুক্তি লাভ করি যে ***'লা আলাইয়া ওয়ালা আলী'*** অর্থাৎ আমি কোন পুরস্কার চাই না আর আমাকে যেন শাস্তিও দেওয়া না হয়। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৬৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন,হযরত উমর (রা.)-এর ন্যায় মানুষ, যিনি তার সারা জীবনই ইসলাম ধর্মের বেদনা ও চিন্তায় (নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্য) ভুলে গেছেন। যিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নত থেকে উন্নততর ত্যাগ স্বীকার করেছেন, যদিও আমলের দিক থেকে তাঁর ত্যাগ হযরত আবু বকর (রা.)-এর কুরবানীর মানে পৌঁছে নি, কিন্তু ইচ্ছা ও নিয়্যতের দিক থেকে সবার (কুরবানী) এক সমান ছিল। হযরত আবু বকর (রা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন তখন হযরত উমর (রা.)-এর চোখ থেকে অশ্রু বইতে থাকে। আর তিনি বলেন, খোদা তা'লা আবু বকর (রা.)-এর প্রতি কল্যাণ বর্ষণ করুন। আমি বহুবার তাঁর চেয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কখনো সফল হই নি। একবার মহানবী (সা.) বলেন, আর্থিক কুরবানী কর, তখন আমি আমার অর্ধেক সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হই আর ভাবি যে, আজ আমি হযরত আবু বকর (রা.)-এর চেয়ে এগিয়ে যাব। কিন্তু আবু বকর (রা.) আমার পূর্বেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন আর তার সাথে যেহেতু মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কও ছিল এবং তিনি (সা.) জানতেন যে, তিনি কিছুই ছেড়ে আসেন নি, তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে আবু বকর! ঘরে কী রেখে এসেছ? তিনি বলেন, ঘরে খোদা এবং রসূল (সা.) -এর নাম রেখে এসেছি। এ কথা বলে হযরত উমর কাঁদতেন এবং বলতেন, তখনও আমি তাঁর চেয়ে এগিয়ে যেতে পারি নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এগুলো ছিল তাঁর কুরবানী। হযরত আবু বকর (রা.) পূর্বেও দান করতেন, কিন্তু যখন বিশেষ উপলক্ষ্য আসে তখন তিনি সবকিছু এনে উপস্থাপন করেন। একদিকে ছিলেন এরা আর অপরদিকে রয়েছে তারা যারা নিজেদের সম্পদের এক-দশমাংশ কুরবানী করারও সৌভাগ্য পায় না অথচ বলে বেড়ায় যে, আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। মৃত্যু বরণের সময় হযরত উমর (রা.)-এর চোখ বার বার অশ্রুসজল হয়ে উঠতো আর তিনি বলতেন, হে খোদা! আমি কোন পুরস্কারের যোগ্য নই। আমি কেবল শাস্তি থেকে রক্ষা পেতে চাই।

(খুতবাতে মাহমুদ, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৪)

অতঃপর দাফন এবং জানাযা সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পুত্র হযরত আব্দুল্লাহ্ তাকে গোসল দেন। হযরত ইবনে উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদে নববীতে হযরত উমরের জানাযার নামায আদায় করা হয় আর হযরত সোহায়েব তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মহানবী (সা.)-এর মিম্বর ও কবরের মধ্যবর্তী স্থানে তাঁর জানাযার নামায আদায় করা হয়। হযরত জাবের থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমরকে কবরে নামানোর জন্য উসমান বিন আফফান, সাঈদ বিন যায়েদ, সোহায়েব বিন সিনান আর আব্দুল্লাহ্ বিন উমর নেমেছিলেন।(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৯-২৮১) (উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৬)

তাদের ছাড়া হযরত আলী, হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ, হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস এবং হযরত তালহা আর হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম এর নামও পাওয়া যায়।

(সৈয়্যদানা উমর ফারুক আযাম, প্রণেতা-মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ৮৬৭-৮৬৮) (আল ফারুক, প্রণেতা-শিবলী নোমানী, পৃ: ১৬৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পুণ্যবানদের পাশে দাফন হওয়াও এক নেয়ামত। হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে লিখিত আছে যে, মৃত্যু শয্যায় থাকা অবস্থায় তিনি হযরত আয়েশার কাছে বার্তা পাঠান যে, মহানবী (সা.)-এর (কবরের) পাশের জায়গাটি যেন তাকে দেওয়া হয়। হযরত আয়েশা (রা.) ত্যাগ স্বীকার করে সেই স্থানটি তাকে দিয়ে দিলে তিনি বলেন, ***'মা বাকেয়া লী হাম্মুন বা'দা যালিক'*** অর্থাৎ এখন এরপর আমার আর কোন দুঃখ নেই যখন কিনা আমি মহানবী (সা.)-এর রওজায় সমাহিত হব। (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ২৮৬)

অপর এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আগ্রহের সাথে আল্লাহ্ তা'লার আঁচলকে আঁকড়ে ধরে তাকে তিনি কখনো বিনষ্ট করেন না, যদিও জগতের প্রতিটি বস্তুই তার শত্রু হয়ে যাক না কেন। আর আল্লাহ্‌র সন্ধানী কোন ক্ষতি বা কষ্টের সম্মুখীন হয় না। আল্লাহ্ তা'লা সত্যবাদীদের অবান্ধব ও অসহায় পরিত্যাগ করেন না। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদের উভয়ের অর্থাৎ আবু বকর ও উমরের সততা ও নিষ্ঠা কতই না উন্নত মানের! তারা উভয়ে এমন বরকতমণ্ডিত সমাধিস্থলে সমাহিত হয়েছেন যে, মূসা ও ঈসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তাহলে শত ঈর্ষার সাথে সেখানে সমাহিত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন, কিন্তু এই মর্যাদা কেবল বাসনা থাকলেই লাভ হতে পারে না, আর কেবল চাইলেই তা প্রদান করা যায় না, বরং এটি তো সর্বাধিপতি খোদা পক্ষ থেকে এক স্থায়ী কৃপা আর এই কৃপা কেবল সেসব লোকের প্রতিই অবতীর্ণ হয় যাদের প্রতি ঐশী দান সদা মনোযোগী থাকে। "(সিররুল খিলাফাহ, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর যখন মৃত্যু পথযাত্রী ছিলেন তখন তিনি মহানবী (সা.)-এর চরণে সমাহিত হওয়ার মানসে পরম ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন। অতএব তিনি হযরত আয়েশাকে বলে পাঠান যে, আপনি অনুমতি দিলে আমি তাঁর (সা.)-এর পাশে সমাহিত হতে চাই। হযরত উমর সেই মানুষ ছিলেন যার সম্পর্কে খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরাও লিখে যে, তিনি এমনভাবে রাজত্ব করেছেন যা জগতে আর কেউ করে নি। তারা অর্থাৎ খ্রিষ্টান ঐতিহাসিকরা মহানবী (সা.)-কে গালি দেয়, কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর প্রশংসা করে। সার্বক্ষণিক সান্নিধ্য লাভকারী ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ও এই বাসনা ব্যক্ত করেন যে, মহানবী (সা.)-এর চরণে যেন তার ঠাঁই হয়। যদি মহানবী (সা.)-এর কোন একটি কাজেও এই বিষয়টি প্রকাশ পেতো যে, তিনি খোদার সন্তুষ্টির জন্য কাজ করেন না, তাহলে কী হযরত উমরের ন্যায় ব্যক্তি এরূপ মর্যাদায় উপনীত হয়ে কখনো তাঁর (সা.) চরণে স্থান লাভের বাসনা করতেন?

(দুনিয়া কা মহসিন, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৬২)

অতএব এটিই মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা, যার কারণে হযরত উমরেরও তাঁর (সা.) চরণে স্থান লাভের বাসনা হয়েছে।

হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যু: মৃত্যুর সময় হযরত উমরের বয়স কত ছিল- এ সম্পর্কেও বিভিন্ন মত রয়েছে। জন্মসাল সম্পর্কেও বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, এ কারণে মৃত্যুর সন সম্পর্কেও ভিন্ন ভিন্ন উক্তি রয়েছে। যেমন তাবারি, উসদুল গাবা, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, রিয়াযুন নাযারা, তারীখুল খুলাফা ইত্যাদিগ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়াতে তাঁর বয়স ৫৩ বছর, ৫৫ বছর, ৫৭ বছর, ৫৯ বছর, ৬১ বছর, ৬৩ বছর এবং ৬৫ বছর বর্ণিত হয়েছে। (তারিখে তাবারী, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ২১১) (উসদুল গাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬৬) (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৯২-১৯৪) (রিয়াজুন নাজরাহ, পৃ: ৪১৮-৪১৯) (তারিখুল খোলাফাহ, প্রণেতা ইমাম জালালুদ্দীন সুইতি, পৃ: ১৬৮)

যদিও সহীহ্ মুসলিম ও তিরমিযির রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁর বয়স ৬৩ বছর বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত্যুর সময় মহানবী (সা.)-এর বয়স ছিল ৬৩ বছর, হযরত আবু বকর এর মৃত্যুর সময়

বয়স ছিল ৬৩ বছর আর হযরত উমরেরও মৃত্যুর সময় বয়স ছিল ৬৩ বছর।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়েল, হাদীস-৬০৯১) (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৫৩)

হযরত উমরের মৃত্যুতে কতিপয় সাহাবীর অভিব্যক্তি রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, হযরত উমরের পবিত্র শবদেহ জানাযার জন্য রাখা হয় আর মানুষ তাঁর আশেপাশে দাঁড়িয়ে যায়। তাকে উঠানোর পূর্বে তারা দোয়া করতে থাকে। এরপর তারা জানাযার নামায পড়ে আর আমিও তাদের মাঝে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে চকিত করে। আমি দেখি যে, তিনি হলেন হযরত আলী বিন আবি তালেব। তিনি হযরত উমরের জন্য রহমত কামনা করে দোয়া করেন আর বলেন, তিনি এমন কোন ব্যক্তিকে রেখে যান নি যে আমার কাছে এই দিক থেকে তার চেয়ে অধিক প্রিয় হবে যে, আমি তার মতো আমল করে আল্লাহ্ তা'লার সাথে মিলিত হব। খোদার কসম, আমি এটিই মনে করতাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তাকেও তার সাথীদের সাথেই রাখবেন, অর্থাৎ হযরত উমরকেও তার সাথীদের সাথেই রাখবেন। আর আমি জানি, মহানবী (সা.)-এর কাছে বহুবার আমি এটি শুনেছি যে, তিনি বলতেন, ***'যাহাবতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর, ওয়া দাখালতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর, ওয়া খারাজতু আনা ওয়া আবু বকরীন ওয়া উমর'***। অর্থাৎ, আমি এবং আবু বকর আর উমর যাই, আমি এবং আবু বকর আর উমর প্রবেশ করি, আমি এবং আবু বকর আর উমর বের হই।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৮৫)

অর্থাৎ বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এই বাক্যগুলো তিনি উচ্চারণ করতেন।

জাফর বিন মুহাম্মদ তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে যখন গোসল করানোর পর কফনের কাপড় পরিধান করিয়ে খাটিয়ায় শুইয়ে রাখা হয়, তখন হযরত আলী (রা.) তার লাশের পাশে দাঁড়িয়ে তার প্রশংসা করেন এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম, এই চাদরে আবৃত ব্যক্তির তুলনায় অন্য কেউ এই ধরাপৃষ্ঠে আমার কাছে বেশি প্রিয় নয় যার আমলনামা নিয়ে আমি খোদার দরবারে উপস্থিত হব। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮২)

আবু মাখলাদ বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী বিন আবি তালেব বলেন, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর আমাদের মাঝে হযরত আবু বকর সর্বোত্তম ব্যক্তি। আর হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পূর্বেই আমরা বুঝতে পারি যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অবর্তমানে হযরত উমর (রা.) আমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি।

(সীরাত উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা-ইবনে জুযি, পৃ: ২১২)

জায়েদ বিন ওয়াহাব বর্ণনা করেন যে, আমরা হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-র নিকট গেলে তিনি হযরত উমর (রা.)-এর স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এত বেশি কাঁদেন যে, তার চোখের জলে কঙ্কর পর্যন্ত সিক্ত হয়ে যায়। এরপর তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.) ইসলামের সুরক্ষিত দুর্গ ছিলেন, মানুষ এতে প্রবেশ করে আর বের হতো না। তিনি একটি দৃঢ় দুর্গসদৃশ ছিলেন যাতে প্রবেশের পর মানুষ আর বের হতো না। তার মৃত্যুতে এই দুর্গে ফাঁটল সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষ ইসলাম পরিত্যাগ করছে।(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৩)

আবু ওয়ায়েল বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর জ্ঞান যদি এক পাল্লায় আর অন্য সকল মানুষের জ্ঞান অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে হযরত উমরের পাল্লা ভারী হবে। আবু ওয়ায়েল বলেন, ইব্রাহীমের কাছে আমি এর উল্লেখ করলে তিনি বলেন, খোদার কসম! বিষয়টি এরূপই, আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) এর চেয়েও বড় কথা বলেছেন। আমি জিজ্ঞেস করি যে, তিনি কী বলেছেন? তিনি বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তিনি বলেন যে, জ্ঞানের দশ ভাগের নয় ভাগ হারিয়ে গেছে।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৫১)

হযরত আনাস (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাত হলে হযরত আবু তালহা বলেন, আরবে শহুরে বা গ্রাম্য এমন কোন ঘর নেই যেটি হযরত উমর (রা.)-এর শাহাদাতের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

অর্থাৎ, তিনি সবার এতটা সাহায্য-সহযোগিতা করতেন যে, তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা প্রভাবিত হবে।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম হযরত উমর (রা.)-এর জানাজার পর হযরত উমর (রা.)-এর খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, হে উমর! আপনি কতইনা উত্তম মুসলিম ভাই ছিলেন, সত্যের জন্য উদার এবং মিথ্যার জন্য কৃপণ ছিলেন। সন্তুষ্টি প্রকাশের ক্ষেত্রে আপনি সন্তুষ্ট হতেন এবং ক্রোধের সময় আপনি রাগ করতেন। আপনি পবিত্র দৃষ্টি ও বড় মনের মানুষ ছিলেন। অহেতুক প্রসংশাকারীও ছিলেন না আর গীবত তথা পরনিন্দাকারীও ছিলেন না। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮২)

একটি রেওয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতে হযরত সাঈদ বিন যায়েদ যখন কাঁদছিলেন তখন জনৈক ব্যক্তি বলেন, হে আবুল আ'ওর! আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বলেন, আমি ইসলামের জন্য কাঁদছি। নিশ্চিতভাবে হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতে ইসলামে এমন বিপত্তি দেখা দিয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত পূর্ণ হবে না। (আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৪)

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমরা বলতাম, মহানবী (সা.)-এর উম্মতে তাঁর পর সর্বোত্তম হলেন হযরত আবু বকর (রা.), এরপর হযরত উমর (রা.), অতঃপর হযরত উসমান (রা.)।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-৪৬২৮)

হযরত হুযায়ফা বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর যুগে ইসলামের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির মতো ছিল যে ক্রমাগতভাবে উন্নতির পথে ধাবমান ছিল। তাঁর শাহাদাতে সেই যুগ পিঠ ফিরিয়ে নেয় আর এখন অনবরত পেছনের দিকে যাচ্ছে।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৫)

হযরত উমর (রা.)-এর সহধর্মিনী ও সন্তানদের বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে যে, বিভিন্ন সময় তাঁর দশজন সহধর্মিনী ছিলেন যাদের গর্ভে নয়জন পুত্র ও চার জন কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তাদের মাঝে একজন ছিলেন হযরত হাফসা (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। হযরত যয়নব বিন মাযঊন ছিলেন প্রথম স্ত্রী যিনি হযরত উসমান বিন মাযঊনের সহোদরা ছিলেন এবং যার গর্ভে হযরত উমর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ্, আব্দুর রহমান আকবর এবং কন্যা হযরত হাফসার জন্ম হয়।(তাঁর সহধর্মিনী) হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী বিন আবু তালেবের গর্ভে যায়েদ আকবর এবং রুকাইয়্যার জন্ম হয়। মোলায়কা বিনতে যারওয়াল যিনি উম্মে কুলসুম নামেও সুপরিচিত। তার গর্ভে যায়েদ আসগার এবং উবায়দুল্লাহ্‌র জন্ম হয়। কুরায়বা বিনতে আবু উমাইয়া মাখযুমী। যেহেতু মোলায়কা এবং কুরায়বা ঈমান আনেন নি তাই হযরত উমর (রা.) ষষ্ঠ হিজরীতে তাদের উভয়কে তালাক দিয়ে দেন। হযরত জামিলা বিনতে সাবেত, পূর্বে যার নাম ছিল আসিয়া, মহানবী (সা.) তার নাম পরিবর্তন করে জামিলা রাখেন। তিনি বদরী সাহাবী হযরত আসেম বিন সাবেত (রা.)-এর সহোদরা ছিলেন। তার ঘরেহযরত উমরের যে সন্তান হয় তার নাম আসেম। লাওহিয়ার গর্ভে তাঁর (রা.) সন্তান আব্দুর রহমান আওসাতের জন্ম হয়। আরেকজন সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি উম্মে ওয়ালাদ ছিলেন (অর্থাৎ সেই দাসী যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে যদি সন্তানের জন্ম হয় তাহলে সে দাসী স্বাধীন হয়ে যায়) যার গর্ভে আব্দুর রহমান আসগারের জন্ম হয়। হযরত উম্মে হাকিম বিনতে হারেসের গর্ভে তাঁর কন্যা ফাতেমার জন্ম হয়। ফুকায়হার গর্ভে তাঁর সন্তান যয়নবের জন্ম হয়। হযরত আতেকা বিনতে যায়েদের গর্ভে তাঁর পুত্র আইয়্যাযের জন্ম হয়।

(আল খুলাফায়ে রাশেদুন, প্রণেতা- মহম্মদ রেজা, পৃ: ১০০) (আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলী নুমানী, পৃ: ৪০৪) (উসদুল গাবাহ, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, লেবানন, ২০০৩)

হযরত উমর (রা.)-এর প্রশংসায় প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড গিবন লিখেন, হযরত উমরের ধার্মিকতা এবং বিনয় হযরত আবু বকরের পুণ্যের তুলনায় কোন অংশে কম ছিল না। তাঁর খাবারের তালিকায় ছিল কেবল যবের রুটি এবং খেজুর। পানীয় বলতে ছিল কেবল সুপেয় পানি। বারো জায়গায় ছিঁড়ে যাওয়া আলখেল্লা পরে তিনি মানুষকে তবলীগ করতেন। ইরানের যেগভর্নর এ বিজেতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছেন তিনি হযরত উমরকে মসজিদে নববীর সিঁড়িতে ফকীর-দরবেশদের সাথে ঘু মাতে দেখেছেন। অর্থকড়ি লাগামহীন চিন্তাধারার উৎস হয়ে থাকে। আয়উপার্জন বৃদ্ধির কারণে উমর এই যোগ্যতা লাভ করেন যে, নিষ্ঠাবানদের পূর্বাপর সেবার নিরিখে তাদের জন্য ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হন। নিজের ভাতার বিষয়ে তিনি ভ্রুক্ষেপহীন ছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম মহানবী (সা.)-এর চাচা হযরত আব্বাসের জন্য পঁচিশ হাজার দিরহাম অথবা রুপার টুকরোর পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাতা নির্ধারণ করেন। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মহান সাহাবীদের প্রত্যেকের জন্য পাঁচ হাজার দিরহাম ভাতা নির্ধারণ করেন। মহানবী (সা.)-এর অন্যান্য সাহাবীদের বাৎসরিক তিন হাজার রুপার টুকরো দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

(The decline and fall of the Roman empire. by Edward Gibbon)

মাইকেল এইচ হার্ট তার পুস্তক 'দি হানড্রেড'-এ ইতিহাসের একশজন প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন করেছেন এবং ১ নম্বরে রেখেছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নাম আর উক্ত কিতাবের ৫২ নম্বরে হযরত উমর (রা.)-এর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, উমর বিন খাত্তাব মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা এবং সম্ভবত মুসলমানদের মাঝে সবচেয়ে মহান খলীফা ছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমসাময়িক যুবক এবং তাঁর ন্যায় মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের বছর সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই,তবে সম্ভবত ৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি হবে। প্রারম্ভিক যুগে হযরত উমর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর নবধর্মের সবচেয়ে কঠোর শত্রু, কিন্তু হঠাৎ-ই হযরত উমর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এরপর তিনি তাঁর (সা.) শক্তিশালী সাহায্যকারী হয়ে যান। সেইন্ট পল-এর খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করার সাথে তাঁর ইসলাম গ্রহণের অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। উমর মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকটতম উপদেষ্টাদের অন্তর্ভুক্ত হন এবং তাঁর (সা.) মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এমনই ছিলেন।

৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে নিজের কোন স্থলাভিষিক্ত মনোনীত না করেই মুহাম্মদ (সা.) মৃত্যু বরণ করেন। উমর তৎক্ষণাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘনিষ্ঠ সাথী ও শ্বশুর আবু বকরের খিলাফতের প্রতি সমর্থন জানান; ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব টলে যায়। তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে লিখেছেন, কেননা তারা মানতে প্রস্তুত নয় যে, মানুষজন ঐক্যবদ্ধভাবে তাকে খলীফা নির্বাচিত করেছে। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি বলেন যে, উমর নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর শ্বশুরের হাতে বয়আত করেন, যার ফলে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়ে যায় এবং এর ফলে আবু বকরকে সর্বস্বীকৃতভাবে প্রথম খলীফা,অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে মানা হয়। আবু বকর

একজন সফল নেতা ছিলেন, কিন্তু তিনি কেবল দু'বছরের জন্য খলীফা হিসেবে দায়িত্বপালনের পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে তার অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে উমরের নাম প্রস্তাব করেন। উমর ছিলেন মহানবী (সা.)-এর শ্বশুর; ফলে আরেকবার ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব টলে যায়। তিনি (মাইকেল এইচ. হার্ট) বিষয়টিকে জাগতিকরূপ দিতে চাচ্ছেন; যাহোক তিনি প্রশংসা করছেন। উমর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে খলীফা হন এবং ৬৪৪ সাল পর্যন্ত খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে অর্থাৎ খিলাফতে অধিষ্ঠিত অবস্থায় একজন ইরানী ক্রীতদাস মদিনায় তাঁকে শহীদ করে। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাঁর অবর্তমানে স্থলাভিষিক্ত নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন, যা এভাবে আরেকবার ক্ষমতা নিয়ে সম্ভাব্য সশস্ত্র যুদ্ধ টলিয়ে দেয়। এই কমিটি উসমানকে তৃতীয় খলীফা নির্বাচন করে, যিনি ৬৪৪ সাল থেকে ৬৫৬ সাল পর্যন্ত শাসন করেন।

অতঃপর তিনি লিখেন, হযরত উমর (রা.) -এর এই দশ বছরের খিলাফতকালেই আরবরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজয়গুলো লাভ করে। তাঁর খিলাফতের সংক্ষিপ্ত সময়েই আরব বাহিনী রোমান সাম্রাজ্যাধীন সিরিয়া এবং ফিলিস্তিন আক্রমণ করে। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দে আরব বাহিনী বাইজেন্টাইন তথা রোমানদের বিরুদ্ধে ইরারমূকের যুদ্ধে এমন বিরাট জয় লাভ করে যার ফলে তাদের কোমর ভেঙে যায়। একই বছর দামেস্ক বিজয় হয়। অতঃপর দু'বছর পর জেরুযালেম অস্ত্রসমর্পণ করে। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আরব বাহিনী গোটা ফিলিস্তিন এবং সিরিয়া জয় করে নেয় আর বর্তমান তুরস্কের দিকে অগ্রসর হয়। ৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দে আরবরা রোমান সাম্রাজ্যাধীন মিশরে প্রবেশ করে। তিন বছরের মধ্যে তারা পুরো মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। হযরত উমর (রা.) খিলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই আরবরা পারস্য সাম্রাজ্যাধীন ইরাক আক্রমণ করে। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতে ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে কাদসিয়ার যুদ্ধের মাধ্যমে আরবদের মূলবিজয় সূচিত হয়। ৬৪১ খ্রিষ্টাব্দের ভেতর গোটা ইরাক আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে আর তারা এখানেই থেমে থাকে নি বরং এরপর তারা পারস্য তথা ইরানেও আক্রমণ করে। ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে তারা পারস্যের সর্বশেষ বাদশা'র সেনাদেরশোচনীয়ভাবে পরাজিত করে।

হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর সময়, অর্থাৎ ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম ইরানের অধিকাংশ অঞ্চল আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুতেও আরব সেনাবাহিনী দমে যায় নি। পূর্ব দিকে তারা দ্রুততম সময়ে পারস্য বিজয় নিশ্চিত করে আর পাশাপাশি পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। তিনি (মাইকেল এইচ.হার্ট) লিখেন, উমরের বিজয়াভিযানের ব্যাপ্তি যতটা তাৎপর্যপূর্ণ, এই বিজিত অঞ্চলগুলোর দৃঢ়তাও ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও ইরানীরা মুসলমান হয়ে গিয়েছিল কিন্তু অবশেষে তারা আরব-শাসন থেকে বেরিয়ে যায়, যেখানে সিরিয়া, ইরাক এবং মিশরের অধিবাসীরা এমনটি করে নি। তারা আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যায় এবং আজ অবধি এমনই আছে। তিনি আরো লিখেন, নিঃসন্দেহে উমর (রা.)-কে তার সেনাবাহিনী কর্তৃক বিজিত বিশাল সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিচালনার স্বার্থে নিয়মনীতি প্রণয়ন করতে হয়েছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, বিজিত অঞ্চলসমূহে আরবদের যেন একটি বিশেষ সামরিক অবস্থান লাভ হয় এবং তারা স্থানীয় অধিবাসীদের থেকে পৃথকভাবে সেনা নিবাসে অবস্থান করে। অধীনস্থ লোকদের মুসলমান আরব বিজেতাদেরকে কেবল একটি কর দিতে হতো। তাদের পুরো শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছিল। এছাড়া তাদের ওপর আর কোন দায়িত্ব ছিল না; বিশেষত মুসলমান হওয়ার জন্য তাদেরকে বাধ্য করা হত না। উক্ত কথা দ্বারা এটি প্রমাণিত হয় যে, আরবের এসব অভিযান বা যুদ্ধ ধর্মীয় লড়াই থেকে বেশি জাতিগত বিষয় ছিল। যদিও ধর্মীয় দিক ছিল না- তা বলা যাবে না। উমর (রা.)-এর সফলতা নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পর ইসলামের বিস্তারে মূল ব্যক্তিত্ব তিনিই ছিলেন। তার (রা.) এই দ্রুত অর্জিত বিজয় ব্যতীত সম্ভবত আজ ইসলাম যতটা বিস্তৃত রয়েছে, ততটা বিস্তৃতি লাভ করত না। অধিকন্তু হযরত উমর (রা.)-এর যুগে বিজিত ভূখণ্ড আজও আরব অঞ্চল হিসেবেই বিদ্যমান। নিঃসন্দেহে মুহাম্মদ (সা.),যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিলেন, অধিকাংশ উন্নতির কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য। কিন্তু হযরত উমর (রা.)-এর ভূমিকা অস্বীকার করাও মস্ত বড় ভুল হবে। তার (রা.) বিজয় মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রভাবাধীন থাকার ফলাফলস্বরূপ এমনিতেই হয়ে যায় নি। কিছুট াবিস্তৃতি অবশ্যই নির্ধারিত ছিল, কিন্তু সেই অসাধারণ সীমা পর্যন্ত নয় যতটা হযরত উমর (রা.) যোগ্য নেতৃত্বে লাভ হয়েছে। পুনরায় তিনি লিখেন, পশ্চিমা বিশ্বের কাছে উমর (রা.)-এর মতো অপরিচিত ব্যক্তিত্বকে শারলিমান এবং জুলিয়াস সিজারের মতো প্রখ্যাত ব্যক্তিদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার আখ্যা দেওয়া হয়ত বিস্ময় সৃষ্টি করবে, কিন্তু উমর (রা.)-এর যুগে আরবের বিজয়গাথা শারলিমান এবং জুলিয়াস সিজারের তুলনায় এর বিশালতা এবং সময়ের দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব রাখে।

(The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History by Michael Hart)

এরপর প্রফেসর ফিলিপ কে.এ.টি. তার পুস্তক 'হিস্ট্রি অব দি আরব'-এ লিখেন, সরল প্রকৃতি সম্পন্ন, মিতব্যয়ী এবং মহানবী (সা.)-এর গতিশীল ও যোগ্য উত্তরসূরী উমর (রা.), যিনি লম্বা এবং সুঠাম দেহ বিশিষ্ট ছিলেন এবং স্বল্পকেশী ছিলেন,তিনি (রা.) খিলাফতের দায়িত্ব লাভের পর কিছুদিন ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবন যাপনের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি তার পুরো জীবন এক মরু-নেতার ন্যায় সরলতার মাঝে অতিবাহিত করেছেন। মূলত উমর (রা.), যার নাম মুসলিম রেওয়ায়েত অনুসারে ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুহাম্মদ (সা.) এর পর সবচেয়ে মহান ছিল; তাকে মুসলমান ঐতিহাসিকরা তাকওয়া, ন্যায়পরায়ণতা এবং সরলতার জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে এবং খলীফার মাঝে বিদ্যমান সকল গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। পুনরায় লিখেন, তার উন্নত চরিত্র সকল বিবেকসম্পন্ন স্থলাভিষিক্তের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বলা হয়, তার কাছে কেবলমাত্র একটি জামা এবং একটি আচকান ছিল আর দুটোতেই স্পষ্টভাবে তালি দেখা যেত। তিনি সামান্য খেজুরের পাতার বিছানায় ঘুমোতেন। ঈমানের দৃঢ়তা, ন্যায়ের শাসন তথা ইসলামের উন্নতি এবং নিরাপত্তা ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তা ছিল না।

(History of The Arabs by Philip K.Hitti, 10th edition, page175, London 1989)

এই বর্ণনা আগামীতেও ধারাবাহিক ভাবে চলতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি কয়েকজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের মাঝে সর্বপ্রথম মোকররমা সাহেবযাদী আসেফা মাসুদা বেগম সাহেবার স্মৃতিচারণ করা হবে। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের ছেলে ডাক্তার মির্যা মোবাশ্বের আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ । তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৌহিত্রী এবং হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবা ও হযরত নওয়াব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা ছিলেন। তিনি ছিলেন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-এর পুত্রবধূ। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি ওসীয়্যতকারিণী ছিলেন। তার অবর্তমানে তিনি এক পুত্র এবং চার কন্যা রেখে গেছেন। তার ছেলে তারেক আকবর সাহেব বলেন, আম্মি সর্বদা জামা'তের প্রতি এবং যুগ খলীফার প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন। সর্বদা জামা'তের সেবা করার এবং ওসীয়্যতের শর্ত পূরণের চেষ্টা করতেন। তিনি তার জীবদ্দশায় হিস্যায়ে জায়েদাদ পরিশোধ করেছেন। প্রত্যেক বছর মরহুমদের পক্ষ থেকে চাঁদা প্রদান করতেন। দরিদ্রদের গোপনে মুক্তহস্তে দান করতেন। কর্মচারীদের বিষয়ে আমাকে তিনি সর্বদাই বলতেন, এরা তোমার ভাই-বোনের মতো, অতএব এদের খেয়াল রেখো। তিনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার চেষ্টা করতেন। তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন যেন তাদের কোনরূপ কষ্ট না হয়। নামাযে নিয়মিত এবং আল্লাহ্‌র হক ও বান্দার হক আদায়কারী একজন মহিলা ছিলেন।

তার পুত্রবধূ নাঈমা সাহেবা বলেন, আমেরিকায় আমাদের ঘরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে তিনি বলেন, এই ঘরে জিনিসপত্র ঢুকানোর পূর্বে প্রতিটি কক্ষে ও কোণায় নফল পড়ে নিও। তিনি আরো বলেন, আমার মায়ের মৃত্যুর পর তিনি আমাকে বলেন, তুমি ভাববে না যে, তুমি মাতৃহীন, আমি তোমার মা। আর সত্যিই তার ভালোবাসাপূর্ণ এবং দোয়াগো ব্যক্তিত্ব আমাকে নিজ মেয়েদের চেয়েও বেশি ভালোবাসা দিয়েছে। এরপর তিনি সর্বদা এই নসীহত করতেন যে, খেলাফতের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। আমার সাথে তার বিভিন্নভাবে আত্মীয়তা ছিল, কেননা তিনি অন্য মায়ের দিক থেকে আমার দাদীর বোনও ছিলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমার দাদীও ছিলেন আর খালাও ছিলেন আবার ফুপুও ছিলেন। এসব আত্মীয়তা সত্ত্বেও তিনি বলতেন, আমি শুধু যুগ-খলীফার অনুগত। এগুলো কেবল কথার কথা নয়, বরং সত্যিকার অর্থেই যুগ-খলীফার সাথে তার এই সম্পর্ককে তিনি বিশ্বস্ততার সাথে রক্ষা করেছেন। অজস্র দান-খয়রাত করতেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা জামা'তের বিভিন্ন বুযুর্গ ও শিক্ষক, এমনকি কাদিয়ানের বিভিন্ন কর্মচারীর পক্ষ থেকেও নিজেই আদায় করতেন। যখন কোন কর্মচারীর বিদায় নিত, তখন তিনি কিছু -না-কিছু দিয়ে তাকে বিদায় দিতেন এবং এটিও বলতেন যে, যদি কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে ক্ষমা করে দিও।

তার এক কন্যা শাহেদা বলেন, ছোট বয়সেই আমাদের মা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে পরিচিত করে দিয়েছেন। তিনি বলতেন, জুতার ফিতাও যদি চাইতে হয়, খোদা তা'লার কাছে চাও আর বেশি বেশি দোয়া কর। আর খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার বিষয়ে তিনি অনেক নসীহত করতেন। খলীফা নির্বাচনের সময় এলে তিনি বলেছিলেন, যিনিই খলীফা নির্বাচিত হবেন তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করতে হবে আর একথাও বলতেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সবুজ সতেজ শাখা হওয়ার জন্য দোয়া করবে, শুষ্ক শাখা হবে না আর কারো পদস্খলনের কারণ হবে না।

এরপর তার কন্যা নুসরত জাহান বলেন, আমাদের ছোট বয়স থেকেই তরবিয়তের বিষয়টি তিনি দৃষ্টিপটে রেখেছেন। পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সময় কোন আয়াতে থেমে গিয়ে আমাদেরকে সেই আয়াতের মর্ম বুঝাতেন বা অন্য কোন নসীহত করতেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সর্বদা অতীত বুযুর্গদের স্মৃতিচারণ করতেন। অনেক অমূল্য ও শিক্ষণীয় ঘটনা তার জানা ছিল, যা তিনি অধিকাংশ সময়ই পুনরাবৃত্তি করতেন এবং আমাদেরকে শোনাতেন।

হযরত নবাব আমাতুল হাফীয সাহেবার কন্য লাহোর জেলার লাজনার সদর ফৌজিয়া শামীম সাহেবা বলেন, তিনি এক অসাধারণ নারী ছিলেন। যখনই তাকে চাঁদার জন্য বলা হতো তিনি আশ্বস্ত হলে মন খুলে চাঁদা দিতেন। তিনি কখনো মৌখিকভাবে আবার কখনো চিরকুটে লিখে চাঁদার ওয়াদা করতেন আর মোটা অংকের চাঁদা আদায় করতেন। তিনি চাঁদা আদায়ের পাশাপাশি একথাও বলতেন যে, এই চাঁদার কথা কোথাও যেন উল্লেখ না করা হয়। নিতান্তই সরল মহিলা ছিলেন। ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে তিনি খুবই সাদাসিধে ছিলেন, এমনকি কিছু লোক তাকে কৃপণ মনে করতো, কিন্তু নিজে সাদাসিধে থাকলেও দ ান-খয়রাতের ক্ষেত্রে মুক্তহস্তে দান করতেন। তিনি বলেন, একবার আমি মসজিদের জন্য নিজ অঞ্চলে

চাঁদার আহ্বান জানাই, এ বিষয়ের উল্লেখ করলে তিনি বৃহৎ অংকের টাকা, অর্থাৎ প্রায় এক কোটি রুপি চাঁদা হিসাবে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

এরপর তার দৌহিত্রী রাযিয়া বলেন, শৈশব থেকেই তিনি অনেক ভালো ভালো কথা বলতেন এবং দিকনির্দেশনা দিতেন। ছোট বয়স থেকেই ভবিষ্যত সৌভাগ্যের জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। পুণ্যবান স্বামী লাভের জন্য দোয়া করার নসীহত করতেন। কম বয়সে লজ্জা পেলে বলতেন, আল্লাহ্ তা'লার কাছে বলতে লজ্জা পাওয়া উচিত নয়, তঁ ার কাছে মন খুলে চাও। ধর্মীয় পুস্তকাদি নিয়মিত পড়তেন আর অধিকাংশ সময় সফরকালে দোয়া ও দোয়া সম্পর্কিত কবিতা পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন আর তার সন্তানদের ও পরবর্তী প্রজন্মকে তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ কাজাকিস্তানের প্রাক্তন আমীর রোলান সাইন বাইফ সাহেবের স্ত্রী মোকাররমা ক্লারা আপা সাহেবার। তিনি গত মাসে মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رَاجِعُوۡنَ। কাজাকিস্তানের মুবাল্লেগ আতাউর রব চিমা সাহেব লিখেন, ৯৪ বা ৯৫ সালের দিকে তিনি বয়আত করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি কাজাকিস্তানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যা ছিলেন। তার স্বামী মোহতরম রোলান সাইন বাইফ সাহেব কাজাকিস্তানের প্রথম আমীর এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাও ছিলেন এবং কাযাখ ভাষার একজন প্রখ্যাত লেখকও ছিলেন। ক্লারা সাহেবা নিজেও বেশ ভালো অনুবাদক ও লেখিকা ছিলেন। কাজাকিস্তানে জামা'ত প্রতিষ্ঠার গৌরব ক্লারা সাহেবা ও তার স্বামী মোহতরম রোলান সাহেবেরই প্রাপ্য। মোহতরমা ক্লারা সাহেবা কাযাখ ভাষায় পবিত্র কুরআন অনুবাদও করেছেন যদিও সেটি প্রকাশিত হয় নি, তথাপি এর মাধ্যমে জামা'তের প্রতি তার ভালোবাসা স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি আকুল হয়ে কাজাকিস্তান জামা'তকে ফুলেফলে সুশোভিত দেখতে চাইতেন আর এর জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টাকরতেন। স্থানীয় মোল্লারা বিরোধিতার ক্ষেত্রে এই পরিবারের কথা উল্লেখ করার সময় এ কথা অবশ্যই বলে যে, এরা আহমদী আর এরাই কাজাকিস্তানে আহমদীয়াত নিয়ে এসেছে। মরহুমা ক্লারা সাহেবার মেয়ে মারবা সাসিন বাইবা লিখেন, আমার মা খুব ভালো অনুবাদক ছিলেন। বহুমুখী ও দৃঢ় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি খুবই পরিষ্কার ও উজ্জল ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ৯৫ সালে লন্ডনে স্থাপিত কাজাকিস্তানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'হাউস অফ আবায়ী' এর একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। লন্ডনে বসেই তিনি তার পুস্তক 'কাজাকিস্তান' লিখেছিলেন আর সে সময়ই তিনি জামা'তের সাথে পরিচিত হন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.)-এর হাতে বয়আত করার তৌফিক পেয়েছেন। তিনি বলেন, তিনি শুধু তার সন্তানদেরই মা ছিলেন না বরং তাদের জন্যও মাতৃতুল্য ছিলেন যারা তার কাছে সাহায্য ও পরামর্শের জন্য আসতো।

নুরেম তাইবেক সাহেব বলেন, জামা'তের সকল যুবক আহমদীর জন্য এবং সার্বিকভাবে পুরো জামাতে আহমদীয়া কাজাকিস্তানের জন্য তিনি একজন মায়ের ভূ মিকা পালন করতেন। তিনি আরো বলেন, আমি দশ বছর ক্লারা সাহেবার সেই যুগদেখেছি যার প্রাথমিক তিন বছর অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে আর কখনো কখনো এক পাহাড়ের মতো দণ্ডায়মান থেকে তিনিজামা'তের সুরক্ষায় ও জামা'তের সেবায় লেগে থাকতেন। বয়স, অসুস্থতা, অন্যান্য বিষয়াদি ও পুস্তকাদি প্রণয়ন ইত্যাদি কারণেপরবর্তীতে তিনি অনেক ব্যস্ত হয়ে পড়েন, কিন্তু আন্তরিকভাবে সর্বদা জামা'তের কাজে আত্মনিয়োগ এবং খিলাফত ও জামা'তের সাথে সর্বদা নিষ্ঠার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টায় থাকতেন।

অতঃপর বলেন, রোলান সাহেব ও ক্লারা সাহেবাকে কাজাকিস্তানে দীর্ঘসময় ধরে দেশপ্রেম ও জাতির উন্নতির প্রতীকবলে মনে করা হতো। রোলান সাহেবের সফলতার বড় অংশ ক্লারা সাহেবার কাছে ঋণী। তিনি লাজনা ইমাইল্লাহ্ কাজাকিস্তানের একজন সক্রিয় সদরই ছিলেন না, বরং জামা'ত আহমদীয়া কাজাকিস্তানের প্রথম আমীরের একজন শিক্ষিকাও ছিলেন বটে। তিনি বলেন,আমার মনে আছে ৯৬ থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত অথবা এর পরেও তিনি খুবই চমৎকারভাবে জামা'তের মিশন হাউসে লাজনাদের সাপ্তাহিক ক্লাসে সুচারুরূপে লাজনাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতেন। লাজনারা মুরব্বী সাহেবের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করত আর তাদেরকে সেসব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হতো। এরপ র তিনি বলেন, জামা'তে আহমদীয়ার পুস্তকাদির অনুবাদ ক্লারা সাহেবার চেয়ে ভালো আর কেউ করতে পারত না। ক্লারা সাহেবা সকল বুযুর্গ আহমদীর মধ্যে সর্বোত্তম আহমদী ছিলেন যে কারণে তিনি জামা'তের যুবক বয়সের আহমদীদের জন্য আধ্যাত্মিক তরবিয়তের এক মাধ্যম ছিলেন। তার মাঝে জামা'তী মূল্যবোধ তথা প্রকৃত ইসলামের প্রেরণা ছিল। বিপদের সময়ও তিনি কখনো মনোবল হারাতেন না, বরং সবসময় নিজে এবং অন্যদেরও বিজয়ের দিকে নিয়ে যেতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং কাজাকিস্তানে আহমদীয়াত প্রসারের ক্ষেত্রে তার যে প্রচেষ্টা ছিল তা সফল করুন, তার দোয়াসমূহ গ্রহণ করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ উইং কমান্ডার আব্দুর রশিদ সাহেবের, যিনি গত মাসে মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رَاجِعُوۡنَ আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূ সী ছিলেন। তার ছেলে ফারুক বলেন, তার পিতার নাম বাবু শেখ আব্দুল আযিয, যিনি মজলিস কারপরদাযের সেক্রেটারী ছিলেন এবং তার জেঠা ছিলেন খান সাহেব ফারযান্দ আলী খান সাহেব, যাকে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জামা'তের ইতিহাসে লাহোরের প্রথম আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। তার পিতা যুবক বয়সে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, রশিদ সাহেব তার পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। রশিদ সাহেবের পিতার আহমদীয়াত গ্রহণের কারণে প্রথম স্ত্রী, দুই কন্যা সন্তানকে রেখে চলে যায়। এরপর তিনি দ্বিতীয় বিবাহ করেন এবং সেই ঘরে রশিদ সাহেবের জন্ম হয়। তিনি বলেন, পিতামাতার খুবই আজ্ঞানুবর্তী ছিলেন, তাদের সেবা করতেন, আনুগত্যের সাথে তাদের সব কথা মান্য করতেন। পাকভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত পিতা কাদিয়ানেই শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর বলেন,দেশবিভাগের সময় তিনিও অন্যান্য কাফেলার সাথে কাদিয়ান থেকে লাহোরে পৌঁছেন এবং প্রথম দিকের কয়েকটি পরিবারের সাথে পিতামাতাসহ রাবওয়াতে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। ৫৪ সালের দিকে তিনি এয়ার ফোর্সে কমিশন নেন এবং বিভিন্ন এয়ার বেইসে নিযুক্ত থাকেন। তিনি যেখানেই ছিলেন আহমদীয়াতের প্রচার করতেন। তাকে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে লিবিয়াতে কিছু সময়ের জন্য ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছিল, যদিও তার ফাইলে লিখা ছিল তিনি কাদিয়ানী, যেতে পারবেন না, কিন্তু তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তা সত্ত্বেও তাকে প্রেরণ করেন, কেননা তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, তোমার মতো এমন অফিসার আমি আর কাউকে দেখছি না। তিনি বলেন, আমার পিতা বলতেন, একবার লিবিয়াতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষা ৎ ছিল। তিনি যখন রাষ্ট্রদূতের অফিসে প্রবেশ করেন তখন তিনি দেখেন যে, রাষ্ট্রদূতের একপাশে আরবী ভাষায় জামা'তের বিরোধিতামূ লক বইপুস্তক ও লিফলেট রাখা আছে। অতএব রশিদ সাহেব অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে রাষ্ট্রদূতকে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কী আর কেন রেখেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, এসব কিছু বৃথা ও অনর্থক, চিন্তা করবেন না। তিনি বলেন, জিয়াউল হকের সরকারের পক্ষ থেকে ছাপিয়ে আমাদের কাছে পাঠানো হয়েছে যেন আমরা এই দেশে তা বিতরণ করি এবং সকল আরব দূতাবাসে এটি পাঠানো হয়েছে। এরপর তিনি বলেন, ১৯৮২ সালে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) যখন স্পেনে গিয়েছিলেন তখন সেখানেই তার একটি রিপোর্টের ভিত্তিতে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) তাকে লিবিয়ার আমীর নিযুক্ত করেন এবং তিনি (রাহে.) নিজ হাতে লিখে তাকে নিযুক্তি দেন। তিনি লিবিয়া জামা'তের প্রথম আমীর ছিলেন। নামাযের কথা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা একজন মু'মিনের জন্য তা এমনিতেই আবশ্যক, তিনি নামাযে নিয়মিত ছিলেন, সেই সাথে কুরআন তিলাওয়াত ও চাঁদা প্রদানের ক্ষেত্রেও তিনি খুবই সময়নিষ্ঠ ছিলেন। তিনি তার মৃত্যুর পূর্বে তার হিস্যায়ে আমদ পরিশোধ করেছিলেন। ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদা নিজের পক্ষ থেকে এবং বুযুর্গদের পক্ষ থেকে আদায় করতেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্সানী (রা.)-এর একটি ঘটনা তিনি তার ছেলেকে শুনিয়েছেন। তার ছেলে লিখেন, রাবওয়ার প্রাথমিক দিনগুলোতে কোন এক সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) তাকে ডেকে পাঠান তখন গরমকাল ছিল। তিনি বলেন, আব্বাজান যখন কক্ষে প্রবেশ করেন তখন হুযূর চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিলেন আর তিনি যখন চাটাই থেকে উঠেন তখন হুযূরের দেহে চাটাই-এর দাগ দেখা যাচ্ছিল। তিনি বলেন, এসব কারণে আমাদের মতো শিশুদের হৃদয়েও খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং আনুগত্যের একটি গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠে আর এর অনেক প্রভাবও আমাদের ওপর পড়ে।

১৯৮৪ সালে বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লিডার র‍্যাংক থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, অতঃপর রাবওয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। এরপর সদর উমূ মী এবং বিচার বিভাগে কিছুদিন কাজ করেছেন। দরিদ্রদের লালনকারী এবং সবারঅভাবের খোঁজখবর নিতেন। তিনি আরও বলেন, বিদায় লগ্নে তার শেষ ওসীয়্যতও এটিই ছিল যে, দরিদ্রদের খেয়াল রাখবে।আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি দয়া ও ক্ষমার আচরণ করুন আর সন্তানদেরও তার পুণ্যসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ আমেরিকা নিবাসী জনাব করীম আহমদ নাঈম সাহেবের সহধর্মিণী মোহতরমা জুবায়দা বেগম সাহেবার। তার মৃত্যুও গত মাসে হয়েছে, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رَاجِعُوۡنَ। তিনি হযরত ডাক্তার হাশমত উল্লাহ্ খান সাহেবের কনিষ্ঠপুত্রবধূ ছিলেন। মরহুমা খিলাফতের প্রতি নিবেদিত, পুণ্যবতী এবং নিষ্ঠাবান মহিলা ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ওসীয়্যত করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিন পুত্র ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুনিম নাঈম সাহেব হিউম্যানিটি ফার্স্ট যুক্তরাষ্ট্র-এর চেয়ারম্যান। আর তিনি ছিলেন শহীদ ডাক্তার আব্দুল মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের শাশুড়ি। তার কন্যা আমাতুস শাফি, অর্থাৎ ডাক্তার মান্নান সিদ্দিকী সাহেবের সহধর্মিণী লিখেন, সবার সাথে ভালোবাসাপূর্ণ ব্যবহার করা তার রীতি ছিল এবং সবার জন্য দোয়া করতেন, বিভিন্ন সু পরামর্শ দিতেন, দরিদ্রদের সাহায্য করতেন। কাছের এবং দূরের সকল আত্মীয়স্বজনের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। যৌবনকাল থেকেই নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়তেন। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভরসা রেখে নিজের জীবন কাটিয়েছেন। আমাদের শৈশব থেকেই আমরা তাকে জু মুআর দিন বিশেষ ইবাদত করে কাটাতে দেখেছি। সময়মতো নিজের চাঁদা আদায় করার বিষয়ে তিনি সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও পুণ্যকর্ম করার সৌভাগ্য দিন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হাফীয আহমদ ঘু মান সাহেবের, যিনি কিছুদিন পূর্বে পরলোক গমন করেছেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رَاجِعُوۡنَ। পবিত্র কুরআনের অর্থ ও তফসীর অধ্যয়ন করার তার বিশেষ আগ্রহ ছিল। একইভাবে তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সব বই পড়েছিলেন। রাবওয়াতে জামা'তের কাজ করারও সুযোগ লাভ করেছেন। তিনি খুবই সময়ানুবর্তী, অতিথিপরায়ণ, শিশুদের

জুমআর খুতবা

রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মাঝে এমন লোক ছিল যারা মুহাদ্দাস ছিল। আমার উম্মতে অনুরূপ কেউ থাকলে সে হচ্ছে হযরত উমর।

আবু বকর ও উমর হলো নবী রসূলগণ ব্যতীত জান্নাতের পূর্বাপর সকল বয়োজ্যেষ্ঠদের সর্দার।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা সম্পর্কে কী জান, তিনি সাহাবীগণের মধ্যে কত মহান মর্যাদার অধিকারী? তার মর্যাদা এমন যে, কখনো কখনো তাঁর (রা.) মতামত অনুসারে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। আর তাঁর সম্পর্কে এই হাদীস রয়েছে যে, শয়তান উমরের ছায়া দেখে পলায়ন করে।

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের বিষয়ে সব থেকে বেশি সুদৃঢ় হল উমর (রা.)।

ডাক্তার তাসির মুজতাবা সাহেবের মৃত্যু সংবাদ, তাঁর স্মৃতিচারণ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২৯ অক্টোবর ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (২৯ ইখা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: মহানবী (সা.) যাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.)ও একজন। হযরত আবু মূসা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে মদিনার কোন এক বাগানে ছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দরজা খুলতে বলে। তখন নবী করিম (সা.) বলেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতে সুসংবাদ দাও। আমি আগন্তুকের জন্য দরজা খুলে দেখি, তিনি হযরত আবু বকর (রা.)। আমি তাকে সে বিষয়ের সুসংবাদ প্রদান করি যা মহানবী (সা.) বলেছিলেন। তিনি আল হামদুলিল্লাহ্ বলেন। এরপর অপর এক ব্যক্তি আসে এবং দরজা খুলতে বলে। মহানবী (সা.) বলেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকে জান্নাতের সুসংবাদ দাও। আমি দরজা খুলে দেখি, হযরত উমর (রা.)। আমি তাকে সেকথাই বলি যা নবী করিম (সা.) বলেছেন। তিনি আল হামদুলিল্লাহ্ বলেন। এরপর আরেকজন আসে এবং দরজা খুলে দিতে বলে। মহানবী (সা.) বলেন, তার জন্য দরজা খুলে দাও এবং তাকেও জান্নাতের সুসংবাদ দাও যদিও সে এক বিপদের সম্মুখীন হবে। আমি দরজা খুলে দেখি তিনি হলেন, হযরত উসমান (রা.)। আমি তাকে সেকথা বলি যা মহানবী (সা.) বলেছিলেন। তিনিও আলহামদু লিল্লাহ্ বলেন আর এরপর বলেন, বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তার জন্য কেবল আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করা যায়।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাব ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৯৩)

হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি এবং উসমান জান্নাতি, হযরত আলী জান্নাতি, হযরত তালহা জান্নাতী, হযরত যুবায়ের জান্নাতি, হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ জান্নাতি, হযরত সা'দ বিন আবি অক্কাস জান্নাতি, হযরত সাঈদ বিন যায়েদ জান্নাতি এবং আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ জান্নাতি- একথা তিনি দশ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৭৪৭)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, আমরা একবার নবী করিম (সা.)-এর পাশে ছিলাম, সেই সময় তিনি (সা.) বলেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম তখন আমি নিজেকে জান্নাতে দেখলাম। সেখানে আমি দেখি, এক মহিলা একটি প্রাসাদের পাশে ওযু করছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি এই প্রাসাদ কার? লোকজন বলে, এটি উমর বিন খাত্তাব(রা.)-এর প্রাসাদ। আমি তার আত্মাভিমানের কথা চিন্তা করে সেখান থেকে চলে আসি। হযরত উমর (রা.)ও সেখানে বসে ছিলেন, তিনি (রা.) একথা শুনে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি কি আপনার প্রতিও আত্মাভিমান দেখাব!

(সহীহ আল বুখারী, কিতাব বাদউল খালক, হাদীস-৩২৪২)

আপনি কেন চলে এলেন, সেখানে গিয়ে আশিষমণ্ডিত করতেন!

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, ইল্লিয়্যিনদের কোন ব্যক্তি যখন জান্নাতবাসীদের প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে তখন তার চেহারার কারণে জান্নাত আলোকজ্জ্বল হয়ে ওঠবে যেন তার চেহারা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত উমর (রা.) উভয়ই তাদের অন্তর্ভুক্ত আর তারা দুজন কতই না উত্তম মানুষ।

(সুনানে আবু দাউদ, কিতাব হুরুফুল কিরাআত, হাদীস-৩৯৮৭)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) কতৃক বর্ণিত, নবী করিম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কাছে জান্নাতিদের একজন আসছে, তখন হযরত আবু বকর (রা.) আসলেন। তিনি পুনরায় বলেন, তোমাদের কাছে এক জান্নাতবাসী আসছে, তখন হযরত উমর (রা.) আসেন। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৯৪)

অনুরূপভাবে এক রওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেছেন, আবু বকর ও উমর হলো নবী রসূলগণ ব্যতীত জান্নাতের পূর্বাপর সকল বয়োজ্যেষ্ঠদের সর্দার। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৬৪)

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন উমর বিন খাত্তাব জান্নাত বাসীদের প্রদীপ।

(হুলিয়াতুল আওলিয়া, প্রণেতা- ইমাম আসফাহানি, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩০৯)

হযরত উমর (রা.)-এর মর্যাদা সম্পর্কে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যা মহানবী (সা.) হতে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আকওয়া বিন আমের বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, আমার পরে যদি কোন নবী হত তবে অবশ্যই উমর বিন খাত্তাব হত। (সুনান তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৮৬)

অর্থাৎ এটি নবুয়্যতের অব্যবহতি পরের কথা বলা হয়েছে, নয়তো প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মহানবী (সা.) নিজেই নবীউল্লাহ্ (আল্লাহ্‌র নবী) বলে আখ্যায়িত করেছেন। (সহীহ আল মুসলিম, কিতাবুল ফিতন, হাদীস-৭৩৭৩)

রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত উমরকে মুহাদ্দাস আখ্যায়িত করা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, নিশ্চয় পূর্ববর্তী বিভিন্ন উম্মতে মুহাদ্দাস হতো। আমার উম্মতের মধ্যে যদি কেউ (মুহাদ্দাস) থেকে থাকে তবে সে হচ্ছে উমর বিন খাত্তাব (রা.)। (সুনানে তিরমিযি, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৬৯৩)

হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ্ (স.) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলোর মাঝে এমন লোক ছিল যারা মুহাদ্দাস ছিল। আমার উম্মতে অনুরূপ কেউ থাকলে সে হচ্ছে হযরত উমর। মুহাদ্দাস সেই ব্যক্তি যার প্রতি অজস্র ইলহাম এবং কাশ্‌ফ হয়ে থাকে। অতঃপর বলেন, তোমাদের পূর্ববর্তী বনী ইসরাঈল জাতিতে এরূপ ব্যক্তি ছিল যাদের সাথে আল্লাহ্ বাক্যালাপ করতেন অথচ তারা নবী ছিল না। আমার উম্মতে এরূপ কেউ থেকে থাকলে সে হচ্ছে উমর। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৮৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লা সর্বদা রূপকের ব্যবহার করেন আর প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একজনের নাম আরেকজনকে দিয়ে থাকেন। যে ইব্রাহীমের ন্যায় হৃদয় রাখে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে ইব্রাহীম। আর যে উমর ফারুকের হৃদয় রাখে সে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে উমর ফারুক। তোমরা কি এ হাদীস পড় না যে, যদি এ উম্মতেও মুহাদ্দেস থাকে যার সাথে আল্লাহ্ তা'লা বাক্যালাপ করেন তবে সে হচ্ছে উমর।

এখন এ হাদীসের অর্থ কি এটি যে, হযরত উমরের মাধ্যমে মুহাদ্দাসিয়ত শেষ হয়ে গেছে, কক্ষনো না। বরং এ হাদীসের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির অধ্যাত্মিক অবস্থা উমরের আধ্যাত্মিক অবস্থার ন্যায় হয়ে গেছে সে প্রয়োজনের সময় মুহাদ্দাস হবে। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এ অধমের প্রতিও একবার এ মর্মে ইলহাম হয়েছিল যে, "ফীকা মা'দাতুন ফারুকিয়্যা"। (ফতেহ ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১-এর টিকা)

পূর্ণ ইলহামটি হলো, "اَنْتَ مُحَدَّثُ اللّٰهِ فِيْكَ مَادَّةٌ فَارُوْقِيَّةٌ" অর্থাৎ তুমি আল্লাহ্‌র মুহাদ্দাস, তোমার মধ্যে ফারুকী বৈশিষ্ট্য বা উপকরণ রয়েছে।"

(তাযকিরা, পৃ: ৮২, চতুর্থ সংস্করণ)

যেমনটি আমি বিগত খুতবাগুলোর কোন এক খুতবায় বলেছি, হযরত উমর (রা.) কুরআনের সংরক্ষণ ও সংকলনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে এখানেও উল্লেখ করছি। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে ইয়ামামার যুদ্ধে কুরআনের ৭০ জন হাফেয শহীদ হন। এ সম্পর্কে হযরত যায়েদ বিন সাবেত আনসারী

বর্ণনা করেন, যখন ইয়ামামাতে লোকদের শহীদ করা হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) আমাকে ডেকে পাঠান। সেই সময় তার কাছে হযরত উমর (রা.) ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমার কাছে এসে আমাকে বলেছেন ইয়ামামার যুদ্ধে অনেক লোক শহীদ হয়েছে আর আপনি যদি কুরআনকে সংকলিত করে সংরক্ষণ না করেন আমার আশঙ্কা হয় অন্যান্য যুদ্ধেও ক্বারী এভাবে শহীদ হলে পবিত্র কুরআনের অনেকটা হারিয়ে যাবে। হযরত উমর বলেন, আমার পরামর্শ হলো, পবিত্র কুরআন এক জায়গায় সংকলন করুন। হযরত আবু বকর (রা.) উমর কে বলেন, আমি এমন কাজ কীভাবে করি যা মহানবী (সা.) করেন নি। উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আপনার এই কাজ শুভ হবে। পুনরায় হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, উমর আমাকে বার বার এটাই বলতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা এই বিষয়ে আমার বক্ষ উন্মোচন করে দেন। আর এখন আমি ও এটাই যথার্থ বলে মনে করি যা উমর যথাযথ মনে করেছিলেন, অর্থাৎ কুরআনের সংকলন হওয়া উচিত। এরপর যায়েদ বিন সাবিত (রা.) কুরআনের সংকলণ করার কাজ শুরু করেন।(সহী আল বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, হাদীস-৪৬৭৯)

এর বিস্তারিত বিবরণ আমি পূর্বেই দিয়েছি।

হযরত উমর (রা.) এর কুরআন করিম হিফয করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,আবু উবায়দা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মুহাজের সাহাবীদের মাঝে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের কুরআন হিফয করার বিষয় প্রমাণিত আর তারা হলেন- আবু বকর, উমর, উসমান, আলী, তালহা, সা'দ, ইবনে মাসউদ, হুযাইফা, সালেম, আবু হুরায়রা, আবদুল্লাহ্ বিন সায়েব, আবদুল্লাহ্ বিন উমর এবং আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাযি আল্লাহু আনহুম। "

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪২৯)

এটাও বলা হয় যে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি অবতীণ হওয়া ওহীর সাথে হযরত উমরের (রা.)-এর মতামতের সামঞ্জস্যতা রয়েছে। সিহাহ্ সিত্তার বর্ণনায় হযরত উমরের চিন্তাধারার সাথে ওহীর সামঞ্জস্যের কথা যেসব হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেখানে তিনটি বিষয়ে সামঞ্জস্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। সিহাহ্ সিত্তার রেওয়ায়েতের সংখ্যা সম্মিলিত ভাবে দাড়ায় ৭ (সাত)। সহীহ্ বুখারীতে হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমার মতামত আমার প্রভুর ইচ্ছার সাথে মিলে গেছে। আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের জায়গা বানিয়ে নিতে পারি। তিনি এটি বলেন আর এরপর وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى আয়াত অবতীর্ণ হয়। এছাড়া পর্দার বিষয় বলার পর পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হয়। আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আপনার স্ত্রীদের পর্দা করার আদেশ দিন, কেননা তাদের সাথে ভালো মন্দ উভয় ধরণের মানুষ কথা বলে। এরপর পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হয়। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর স্ত্রীগণ আত্মাভিমানের কারণে মহানবী (সা.) সম্পর্কে জোটবদ্ধ হয়। হযরত উমর (রা.) বলেন, তখন আমি তাদের বললাম, অর্থাৎ সেই স্ত্রীদেরকে যাদের মধ্যে তার কন্যাও ছিল, মহানবী (সা.) যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে আমি আশা করি, তার প্রভু তোমাদের থেকে উত্তম স্ত্রী মহানবী (সা.)-কে দিবেন। এ বিষয়ে এই আয়াত অবতীর্ণ হয় যে, عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ অর্থাৎ আর হতে পারে তিনি যদি তোমাদের তালাক দিয়ে দেন তাহলে তার খোদা তোমাদের পরিবর্তে তার (সা.) জন্য তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী দিবেন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুসসালাত, হাদীস-৪০২)

সহীহ্ মুসলিমে এসেছে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) বলেন, তিন ক্ষেত্রে আমার প্রভুর সাথে আমার কথা মিলে গেছে। মাকামে ইব্রাহীম সম্পর্কে, পর্দা সম্পর্কে এবং বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্ধীদের সম্পর্কে। (সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৬২০৬)

কিন্তু বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে এই রেওয়ায়েতটি সঠিক না। এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেবও কতিপয় দলিলপ্রমাণ উদ্ধৃত করে লিখেছেন। পুরোনো আলেম এবং তফসীরকারীরাও লিখেছেন এবং এটি প্রমাণ করেছেন যে, বদরের যুদ্ধবন্ধীদের শাস্তি দেওয়ার বর্ণনাটি সঠিক নয় আর এর বিস্তারিত বর্ণনা আমি পূর্বে একটি খুতবায় উপস্থাপন করেছি।

সহীহ্ মুসলিমে হযরত উমর (রা.)-এর মুনাফিকদের জানাযা না পড়ার বিষয়েও কুরআনী আয়াতের সাথে মিল পাওয়া যায়। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সুলুল যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার পুত্র আব্দুল্লাহ্ বিন আব্দুল্লাহ্ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয় এবং মহানবী (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে, তিনি (সা.) যেন তার পিতাকে দাফন করার জন্য তাকে তাঁর (সা.) জামা দান করেন। সুতরাং তিনি (সা.) তাকে জামা দিয়ে দেন। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর নিকট তার জানাযার নামায পড়ানোর আবেদন করে। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযার নামায পড়ানোর জন্য যান। এতে হযরত উমর (রা.) দাঁড়িয়ে যান এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাপড় টেনে ধরেন এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আপনি কি তার জানাযার নামায পড়াতে যাচ্ছেন অথচ আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে তার জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। এতে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে (এ বিষয়ে) পূর্ণ অধিকার দিয়েছেন এবং বলেছেন, اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ اَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ: অর্থাৎ তুমি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর। যদি তুমি তার জন্য ৭০ বারও ইস্তেগফার কর (কোন লাভ হবে না) তিনি (সা.) বলেন, আমি ৭০ বারের অধিকবার ইস্তেগফার করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, সে মুনাফিক। কিন্তু (তারপরও) রসূলুল্লাহ্ (সা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তখন মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্ আয়াত وَلَا تُصَلِّ عَلٰۤى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا অবতীর্ণ করেন, অর্থাৎ তুমি মুনাফিকদের মধ্য হতে কখনো তাদের কোন মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়বে না এবং কখনো তাদের কবরে দোয়ার জন্য দণ্ডায়মান হবে না। (সহী মুসলিম, কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবা, হাদীস-৬২০৭)

মদ নিষিদ্ধ হওয়া বিষয়ে হযরত উমর (রা.)-এর চিন্তাধারার কুরআনের ওহীর সাথে মিলের কথা সুনান তিরমিযীতে পাওয়া যায়। হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) দোয়া করেন, হে আল্লাহ্! মদ সর্ম্পকে আমাদের জন্য স্বস্তিদায়ক নির্দেশ অবতীর্ণ কর, তখন সূরা বাকারার আয়াত يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বল, এদুটির মধ্যে মহাপাপ নিহিত আছে এবং মানুষের জন্য সেগুলোর মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে; কিন্তু এই উভয়ের পাপ (ও ক্ষতি) এগুলোর উপকার অপেক্ষা গুরুতর (সূরা বাকারা : ২২০)। যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন হযরত উমর (রা.)-কে এই আয়াত পড়ে শুনানো হয়। এই আয়াত শুনে হযরত উমর (রা.) পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য মদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা বর্ণনা কর, তখন সূরা নিসার আয়াত لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা চেতনাহীন বা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের ধারে কাছে যেয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বল তা অনুধাবন করার যোগ্য হয়ে ওঠ (সূরা নিসা : ৪৪)। হযরত উমর (রা.) পুনরায় আসেন এবং তাঁকে এই আয়াত পড়ে শুনানো হয়। তখন তিনি (রা.) পুনরায় বলেন, হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য মদ-সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সুস্পপষ্টভাবে বর্ণনা কর, তখন সূরা মায়েদার আয়াত

اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ
الْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর এবং নামায হতে বিরত রাখতে চায়- অতএব তোমরা কি নিবৃত্ত হবে? (সূরা মায়েদা : ৯২)। হযরত উমর (রা.) পুনরায় আসেন এবং এই আয়াত তাঁকে পড়ে শুনানো হয় তখন তিনি (রা.) বলেন, আমরা নিশ্চয় এথেকে বিরত থাকব, আমরা বিরত থাকব।

(সুনানে তিরমিযি, কিতাবু তফসীরুল কুরআন, হাদীস-৩০৪৯)

আল্লাহর ওহীর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর চিন্তাধারার সামঞ্জস্যতার সিহাহ্ সিত্তাতে উল্লেখিত এই কথাগুলো ছাড়াও জীবনীকারগণ আরো অনেক ঐকতানের কথা উল্লেখ করেছেন।

(তারিখুল খোলাফা, পৃ: ৯৮, দারুল কুতুবুল আরাবী, বেইরুত, ১৯৯৯)

যেমন আল্লামা সুয়ূতী প্রায় বিশটিমিলের কথা উল্লেখ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, হযরত উমর (রা.)-এর পদমর্যাদা সম্পর্কে কী জান, তিনি সাহাবীগণের মধ্যে কত মহান মর্যাদার অধিকারী? তার মর্যাদা এমন যে, কখনো কখনো তাঁর (রা.) মতামত অনুসারে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হয়ে যেত। আর তাঁর সম্পর্কে এই হাদীস রয়েছে যে, শয়তান উমরের ছায়া দেখে পলায়ন করে। দ্বিতীয়ত এই হাদীসও রয়েছে যে, যদি আমার পরে কেউ নবী হতো তবে উমর হতো। তৃতীয় এই হাদীস রয়েছে যে, পূর্ববতী উম্মতসমূহে মুহাদ্দাস হতো, এই উম্মতে যদি কেউ মুহাদ্দাস থেকে থাকে তবে সে হলো হযরত উমর।"(ইযালায়ে আওহাম, ১ম ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২১৯)

বিভিন্ন যুদ্ধে হযরত উমর (রা.)-এর পরামর্শ প্রদান এবং মহানবী (সা.)-এর তা গ্রহণ করা সম্পর্কে রেওয়ায়েত রয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা নাকি হযরত আবু সাঈদ (রা.) এ ব্যাপারে রেওয়ায়েতকারী আমেশের সন্দেহ ছিল যে, তাদের মধ্যে থেকে কে ছিলেন। যাহোক তিনি বলেন, তবুকের যুদ্ধের দিন মানুষের প্রচণ্ড ক্ষুধা লেগেছিল। (তাই) তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অনুমতি দিলে আমারা আমাদের পানি বহনকারী উট জবাই করে খাব এবং (এর) চর্বি ব্যবহার করব। মহানবী (সা.) বলেন, ঠিক আছে (জবাই) করে নাও। তখন হযরত উমর (রা.) এসে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি যদি এমনটি করেন তাহ লে বাহনের সঙ্কট দেখা দিবে। তবে আপনি লোকদেরকে তাদের কাছে গচ্ছিত পাথেয় নিয়ে আসতে বলুন। অর্থাৎ তাদের নিকট যেসব খাদ্যদ্রব্য রয়েছে সেগুলো নিয়ে আসুক আর এতে বরকতের নিমিত্তে দোয়া করুন। এটি অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ এতে বরকত দান করবেন। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, হ্যা! এটি ঠিক। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) একটি চামড়ার দস্তরখানা আনিয়ে বিছিয়ে দেন এরপর তাদের কাছে রয়ে যাওয়া পাথেয় নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। অর্থাৎ যে খাদ্যসামগ্রীই ছিল তা নিয়ে আসতে বলেন। বর্ণনাকারী বলেন, কেউ এক মুষ্ঠি ভুট্টা আনে, কেউ এক মুষ্ঠি খেজুর আর কেউবা আবার রুটির টুকরো ইত্যাদি নিয়ে আসে। এভাবে এই দস্তরখানায় কিছুটা (খাদ্যসামগ্রী) একত্র হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) তাতে বরকতের জন্য দোয়া করেন। এরপর বলেন, এখন নিজ নিজ পাত্রে (খাবার) নিয়ে নাও আর তারা পাত্রে সেগুলো নিয়ে নেয় এবং সৈন্যদলের সব পাত্র ভরে নেওয়া হয়। এরপর সবাই পরিতৃপ্ত হয়ে খায় আর কিছুটা অবশিষ্টও থেকে যায়। তখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)

বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি– আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহ্র রসূল। যে ব্যক্তি সন্দেহমুক্ত হৃদয়ে এ দুটি সাক্ষ্যসহ খোদার সাথে সাক্ষাৎ করবে তাকে জান্নাত থেকে বিরত রাখা হবে না। (সহী মুসলিম,কিতাবুল ঈমান, হাদীস-১৩৯)

এটি সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত। সহীহ্ বুখারীতে এ রেওয়ায়েতটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াযিদ বিন আবি উবায়েদ হযরত সালমা বিন আকুয়া (রা.) হতে বর্ণনা করেন, এক অভিযানে লোকদের পাথেয়তে ঘাটতি দেখা দেয় আর তাদের কাছে কিছুই ছিল না। ফলে তারা মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজেদের উট জবাই করার অনুমতি নিতে এলে তিনি (সা.) তাদেরকে অনুমতি দিয়ে দিলেন। এরপর হযরত উমর (রা.) তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলে হযরত উমর (রা.)কে তারা (এ বিষয়ে) অবগত করল; তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, তোমাদের উট শেষ হয়ে গেলে তোমাদের কীভাবে চলবে? একথা বলার পর হযরত উমর (রা.) নবী করীম (সা.)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! তাদের উট শেষ হয়ে গেলে তাদের চলবে কীভাবে? তখন মহাবনী (সা.) বললেন, লোকদের মাঝে ঘোষণা দাও! সবাই যেন তাদের গচ্ছিত পাথেয় নিয়ে আসে। এরপর মহানবী (সা.) সেই পাথেয় বা খাদ্যসামগ্রীতে বরকতের দোয়া করেন আর এরপর তাদের পাত্র নিয়ে আসার নির্দেশ দেন। লোকেরা (তাদের পত্র) ভরে ভরে নেওয়া আরম্ভ করে। এমনটি করা শেষ করলে রসূলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল জিহাদু ওয়াস সিরু, হাদীস-২৯৮২)

আযানের সূচনা সম্পর্কেও হযরত উমর (রা.) স্বপ্ন দেখেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ওহী সাহাবীদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) নামে এক সাহাবী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে ওহীর মাধ্যমে আযান শিখিয়েছেন আর মহানবী (সা.) তার সেই ওহীর ওপর ভিত্তি করেই মুসলমানদের মাঝে আযানের প্রচলন করেছিলেন। পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের ওহীও এর সত্যায়ন করে। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমাকেও আল্লাহ্ তা'লা এ আযানই শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ দিন পর্যন্ত আমি একথা ভেবে নীরব থাকি যে, মহানবী (সা.)-এর সমীপে আরেক ব্যক্তি এ বিষয়টি বর্ণনা করেছে। আরেকটি রেওয়ায়েতে একথাও রয়েছে যে, এক ফিরিশতা এসে আমাকে আযান শিখায় আর তখন আমি কিছুটা জাগ্রত ও আধোঘুমে ছিলাম।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৩,পৃ: ২৮২)

সুনান তিরমিযীর রেওয়ায়েত আমি ইতিপূর্বেও বর্ণনা করেছি, কিন্তু এখানেও আবার বলে দিচ্ছি। পরের যেসব বাক্য রয়েছে তা থেকেই বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.) -এর দৃষ্টিতে হযরত উমর (রা.)-এর স্বপ্নের কতটা গুরুত্ব ছিল। মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) তাঁর পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, আমি সকালবেলা মহানবী (সা.)-এর কাছে আসি এবং তাঁকে স্বপ্ন শুনাই। তিনি (সা.) বলেন, অবশ্যই এটি সত্য স্বপ্ন। তুমি বেলালের সাথে যাও, নিশ্চয়ই তোমার চাইতে তার আওয়াজ উঁচু, শ্বাস দীর্ঘ আর তাকে তুমি (সেই বাক্যগুলোই) বলতে থাক যা তোমাকে বলা হয়েছে। তার উচিত হবে সেগুলোর ঘোষণা দেওয়া। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যায়েদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন নামাযের জন্য হযরত বেলাল (রা.)-এর আযান শুনেন তখন তিনি (রা.) তার চাদর হেঁচড়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সেই সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য সহকারে প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই আমি তেমনই দেখেছি যেমনটি সে আযানে বলেছে। বর্ণনাকারী বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, সুতরাং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্রই। অতএব এ কথাটি অধিক নির্ভরযোগ্য।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুস সালাত, বাব মা জাআল ফি বাদইল আযান, হাদীস-১৮৯) অর্থাৎ এখন এ বিষয়টি আরো সত্যায়িত হয়ে গেল।

হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)কে কেমন সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন (আর তার নিকট) মহানবী (সা.)-এর কী মর্যাদা ছিল– এ সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, তিনি অর্থাৎ ইবনে উমর (রা.) একবার নবী করীম (সা.)-এর সাথে কোন সফরে ছিলেন। তিনি হযরত উমর (রা.)-এর একটি উটে আরোহিত ছিলেন যেটি ছিল কিছুটা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির আর সেটি মহানবী (সা.)-এর বাহনকে (পিছনে রেখে) সামনে চলে যেত। সেসময় তাঁর পিতা হযরত উমর (রা.) তাঁকে বলতেন, 'আব্দুল্লাহ্! মহানবী (সা.)-কে পিছনে রেখে কারো সামনে এগোনো উচিত নয়।' মহানবী (সা.)-এর বাহনের সামনে তোমার বাহনের যাওয়াটা ঠিক না। তখন মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমার কাছে এটি বিক্রি করে দাও। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি তো আপনারই। মহানবী (সা.) এটি কিনে নেন এবং বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! এটি এখন তোমার। এটিকে তুমি যেভাবে খুশি কাজে লাগাতে পার। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হিবাহ, হাদীস-২৬১০)

তিনি (সা.) এটি (কিনে) নিয়ে উপহার দিয়ে দেন।

হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) বর্ণনা করেন, সূর্য হেলে যাওয়ার পর মহানবী (সা.) এসে যোহরের নামায পড়েন এবং মিম্বরে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুত মুহূর্তের কথা উল্লেখ করে বলেন, সেই সময় বড় বড় ঘটনা ঘটবে। এরপর তিনি (সা.) বলেন, কেউ কিছু জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করতে পার। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছি তোমরা আমার কাছে যা-ই জানতে চাইবে তা আমি তোমাদের জানিয়ে দেব। একথা শুনে লোকেরা অনেক কাঁদে। মহানবী (সা.) কয়েকবার বলেন, আমাকে প্রশ্ন কর। তখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা সাহ্মী (রা.) দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন, আমার পিতা কে? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, হুযাফা। এরপরও তিনি (সা.) বহুবার বলেন, আমাকে জিজ্ঞেস কর। তখন হযরত উমর (রা.) হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে বলেন, رَضِيْنَا بِاللّٰهِ رَبًّا، وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا , অর্থাৎ আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) আমাদের নবী। এতে মহানবী (সা.) নীরব হয়ে যান। এরপর তিনি (সা.) বলেন, এখনই আমার সামনে এই দেওয়ালের প্রশস্ত দিকে জান্নাত ও জাহান্নাম উপস্থাপন করা হয়েছে; এমন কল্যাণ ও অনিষ্টের (দৃশ্য) আমি কখনোই দেখি নি।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু মোয়াকিতুস সালাত, হাদীস-৫৪০)

বুখারী শরীফে এমনই আরেকটি রেওয়ায়েতের উল্লেখ পাওয়া যায়। (এটি) হযরত আবু মূসা (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) -কে কতিপয় এমন বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে তা তিনি পছন্দ করেন নি। অনেক বেশি প্রশ্ন করা হলে তিনি (সা.) অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদের উদ্দ্যেশে বলেন, তোমরা আমাকে যা খুশি জিজ্ঞেস কর। তখন জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করে, আমার পিতা কে? প্রত্যুত্তরে তিনি (সা.) বলেন, তোমার পিতা হুযাফা। অতঃপর আরেকজন দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতা কে? জবাবে তিনি (সা.) বলেন, শায়বার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম তোমার পিতা। হযরত উমর (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেন তখন তিনি বলেন, হে রসূলুল্লাহ্ (সা.)! মহাসম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্র সমীপে আমরা নিজেদের ভুলত্রুটি হতে তওবা করছি।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৯২)

এরপর বুখারী শরীফেরই আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে যাতে যুহ্রী বর্ণনা করেন, হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) আমাকে বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) বাইরে এলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযাফা জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার পিতা কে? তিনি (সা.) বলেন, তোমার পিতা হুযাফা। এরপর তিনি (সা.) অনেকবার বলেন, আমাকে জিজ্ঞেস কর। তখন হযরত উমর (রা.) নতজানু হয়ে নিবেদন করেন, আমরা এতে সন্তুষ্ট যে, আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) আমাদের নবী। এরপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে যান। (সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৯৩)

হযরত আবু কাতাদা আনসারী (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে তাঁর রোযা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। বর্ণনাকারী বলেন, রসূলুল্লাহ্ (সা.) এতে অসন্তুষ্ট হন। তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রভু, ইসলাম আমাদের ধর্ম এবং মুহাম্মদ (সা.) আমাদের রসূল আর আমাদের বয়আত যে প্রকৃত বয়আত তাতেই আমরা সন্তুষ্ট । (সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস-২৭৪৭)

সহীহ্ বুখারীতে আরেকটি রেওয়ায়েত রয়েছে। (তাতে বর্ণিত হয়েছে যে,) হযরত উমর (রা.) একবার মহানবী (সা.)-এর নিকট আসেন, তখন তিনি (সা.) এক বালাখানায় অবস্থান করছিলেন। হযরত উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাঁর কাছে গিয়ে কী দেখলাম! তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন আর তাঁর এবং চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানা নেই। তাই চাটাই তার পার্শ্ব দেশে দাগ ফেলে দিয়েছে। তিনি খেজুরের আঁশ ভরা একটি চামড়ার বালিশের ওপর হেলান দিয়ে বসে আছেন। আমি মহানবী (সা.) -এর ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখি, আল্লাহ্র কসম! তিনটি কাঁচা চামড়া ছাড়া সেখানে আর কিছুই দেখতে পাই নি। তখন আমি মহানবী (সা.) -কে বলি, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ আপনার উম্মতকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন। কেননা পারস্যবাসী এবং রোমানদেরকে অনেক সম্পদ দেওয়া হয়েছে আর তারা জাগতিক (স্বাচ্ছন্দ্য) লাভ করেছে, অথচ তারা আল্লাহ্র ইবাদত করে না। মহানবী (সা.) হেলান দিয়ে বসেছিলেন। (এ অবস্থাতেই) তিনি (সা.) বলেন, হে খাত্তাবের পুত্র! তুমি কি এখনো সন্দেহে নিপতিত? তারা এমন লোক যাদেরকে এই পার্থিব জীবনেই স্বল্পসময়ে তাদের পছন্দের জিনিস দেওয়া হয়েছে। তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমার ক্ষমার জন্য দোয়া করুন।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, হাদীস-২৪৬৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, একবার হযরত উমর (রা.) তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখলেন, ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। তিনি একটি চাটাইয়ের ওপর শুয়ে আছেন আর চাটাইয়ের দাগ তাঁর পিঠে লেগে আছে। এটি দেখে হযরত উমর (রা.)-এর কান্না পায়। তখন তিনি বলেন, হে উমর! তুমি কাঁদছো কেন? উত্তরে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করেন, আপনার কষ্ট দেখে আমার কান্না পাচ্ছে। কায়সার ও কিসরা কাফের হওয়া সত্ত্বেও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করছে, কিন্তু আপনি এমন কষ্টে দিনাতিপাত করছেন? তখন তিনি (সা.) বলেন, এ পৃথিবী আমার কী কাজের? আমার দৃষ্টান্ত তো সেই আরোহীর ন্যায় যে প্রচণ্ড গরমের সময় একটি উটনীতে সফর করে আর দ্বিপ্রহরের তীব্রতা যখন তাকে ভীষণ কষ্ট দেয় তখন সেই আরোহিত অবস্থায়ই বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় আরাম করে আর স্বল্পক্ষণ পর সে আবার সেই দাবদাহের মাঝে পথ চলা শুরু করে।

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২৯৯-৩০০)

একটি ঘটনা রয়েছে যাতে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে দোয়া করতে বলেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। হযরত উমর (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.)-এর সমীপে আমি ওমরা পালনের অনুমতি চাইলে তিনি (সা.) আমাকে অনুমতি দিয়ে বলেন, লা তানসানা ইয়া আখী মিন দুআইকা। হে আমার ভাই! আমাকে তোমার দোয়ায় ভুলে যেও না। হযরত উমর (রা.) বলেন, এটি এমন একটি বাক্য যার বিনিময়ে গোটা পৃথিবী পেলেও আমি এতটা খুশি হব না। আরেকটি রেওয়ায়েতে এর শব্দে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে আর তা হলো আশরিকনা ইয়া

আখী ফী দুআইক। অর্থাৎ হে আমার ভাই! আমাকেও তোমার দোয়ায় অন্তর্ভুক্ত রেখো। (সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর বাবুদ দোয়া, হাদীস-১৪৯৮)

মহানবী (সা.)-এর সাথে হযরত উমর (রা.)-এর কত গভীর ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল তা এই ঘটনা থেকে বুঝা যায়। এ বিষয়টি পূর্বেও একটি খুতবায় বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)-কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) যখন ইন্তেকাল করেন তখন হযরত উমর (রা.) এ সংবাদ শুনে দাঁড়িয়ে যান এবং বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! রসূলুল্লাহ্ (সা.) ইন্তেকাল করেন নি। হযরত আয়েশা (রা.) বলতেন, হযরত উমর (রা.) প্রায়শই বলতেন, খোদার কসম! আমার হৃদয়ে এ ধারণাই স্থান পায় যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে পুনরুত্থিত করবেন, অর্থাৎ মহানবী (সা.)-কে অবশ্যই উত্থিত করবেন যাতে কিছু লোকের হাত -পা কেটে দিতে পারেন। যাহোক, এরপর হযরত আবু বকর (রা.) এসে সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ নম্বর পাঠ করলে হযরত উমর (রা.)কে প্রকৃত বিষয়টি বুঝার আহ্বান জানান এবং এরপর বিষয়ের অবসান ঘটে।(সহীহ বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৬৭-৩৬৬৮)

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে সাহাবীদের ইজমাও এ বিষয়েই হয়েছে যে, সব নবী মৃত্যুবরণ করেছেন। এর কারণটি হলো, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুতে হযরত উমর (রা.)-এর মনে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, তিনি (সা.) এখনো জীবিত এবং পুনরায় আবির্ভূত হবেন। তাঁর এই বিশ্বাস এতটাই দৃঢ় ছিল যে, তিনি সেই ব্যক্তির শিরোচ্ছেদের জন্যও প্রস্তুত ছিলেন যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এসে যখন সকল সাহাবীর সামনে ওয়ামা মুহাম্মাদুন ইল্লা রসূলুন ক্বাদ খালাত মিন ক্বাবলিহির্ রুসুল আয়াত পড়লেন তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, (এটি শুনে) আমার পা কেঁপে উঠে এবং শোকাভিভূত হয়ে আমি মাটিতে পড়ে যাই। অন্য সাহাবীরা বলেন, আমাদের কাছে মনে হলো এ আয়াতটি যেন আজই অবতীর্ণ হয়েছে। সেদিন আমরা এই আয়াতটি অলিগলি ও বাজারে পড়ে বেড়াই। অতএব কোন নবী যদি জীবিত থাকতেন তাহলে এই দলিল যুক্তিযুক্ত হতো না যে, সকল নবী মৃত্যুবরণ করেছেন, তিনি (সা.) কেন ইন্তেকাল করবেন না? হযরত উমর (রা.) বলতে পারতেন, আপনি কেন ধোঁকা দিচ্ছেন? হযরত ঈসা (আ.) তো এখনো আকাশে জীবিত বসে আছেন। তিনি জীবিত থাকলে আমাদের নবী (সা.) কেন জীবিত থাকতে পারবেন না? কিন্তু সকল সাহাবীর নীরবতা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে , সকল সাহাবীরই বিশ্বাস ছিল, হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যুবরণ করেছেন।

(তোহফাতুল মুলুক, আনোয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৮)

এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও লিখেছেন যা ইতিপূর্বে একটি খুতবায় আমি বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

হযরত উমর (রা.) কীভাবে মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করতেন সে সম্পর্কে হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, রসূলে করীম (সা.) হাজরে আসওয়াদ-এর দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর পর তাতে ঠোঁট রেখে দেন এবং দীর্ঘক্ষণ কাঁদতে থাকেন। তিনি (সা.) ফিরে তাকিয়ে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)কেও কাঁদতে দেখেন। মহানবী (সা.) বলেন, হে উমর! এটি সেই জায়গা যেখানে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া হয়।

আবেস হযরত উমর (রা.) -এর বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে সেটিকে চুমু খেয়ে বলেন, আমি ভালোভাবে জানি, তুমি একটি পাথরমাত্র, অপকার বা উপকার কিছুই করতে পার না। আমি যদি নবী (সা.)-কে তোকে চুমু খেতে না দেখতাম তবে আদৌ তোকে চুমু খেতাম না।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল হাজ্জ, হাদীস-১৫৯৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) একবার তাওয়াফ করছিলেন। হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তাতে তিনি তার লাঠি দিয়ে স্পর্শ করে বলেন, আমি জানি তুমি এক পাথর মাত্র, তোমাতে কোন শক্তিই নেই। কিন্তু আমি কেবল খোদার নির্দেশের অধীনেই তোমাকে চুম্বন করি। একত্ববাদের এই প্রেরণাই তাকে জগতে মহীয়ান করেছে। তিনি এক খোদার তৌহীদ তথা একত্ববাদের পূর্ণ প্রেমিক ছিলেন। তিনি এটি সহ্য করতে পারতেন না যে, তাঁর শক্তিমত্তায় অন্য কাউকে অংশীদার করা হবে, অর্থাৎ খোদা তা'লার শক্তিমত্তায়। নিঃসন্দেহে তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'-এর সম্মানও করতেন, কিন্তু তা খোদা তা'লার নির্দেশ মনে করে করতেন। এ কারণে নয় যে, 'হাজরে আসওয়াদ'-এর কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল, খোদা তা'লা যদি আমাদের কোন তুচ্ছ থেকে তুচ্ছ বস্তুকেও চুমু খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন, তাহলে আমরা সেটিকে চুমু খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত আছি, কেননা আমরা খোদা তা'লার বান্দা, কোন পাথর বা জায়গার বান্দা নই। অতএব তিনি সম্মানও করতেন আর তৌহীদকেও ভুলে যেতেন না। আর এটিই এক সত্যিকার মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। এক প্রকৃত মু'মিন বায়তুল্লাহ্‌কে তেমনই পাথরের এক ঘর মনে করে যেভাবে পৃথিবীতে আরো হাজারো পাথর নির্মিত ঘর রয়েছে। এক সত্যিকার মু'মিন 'হাজরে আসওয়াদ' -কে সেভাবেই পাথর মনে করে যেভাবে পৃথিবীতে আরও কোটি কোটি পাথর রয়েছে, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ্‌র সম্মানও করে, সে 'হাজরে আসওয়াদ'-কে চুমুও খায়, কেননা সে জানে যে, আমার প্রভু আমাকে এসব জিনিসের সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু যদিও সে এ স্থানের সম্মানে 'হাজরে আসওয়াদ'-কে চুমু খায়, তথাপি সে পূর্ণ আস্থার সাথে এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত যে, আমি এক খোদার বান্দা, কোন পাথরের বান্দা নই। এটিই ছিল সেই বাস্তবতা যার প্রকাশ হযরত উমর (রা.) করেছেন। তিনি 'হাজরে আসওয়াদ'-কে লাঠি দিয়ে আঘাত করে বলেন, তোমার কোন গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি তেমনই এক পাথর যেভাবে আরো কোটি কোটি পাথর পৃথিবীতে দেখা যায়, কিন্তু আমার প্রভু নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমার সম্মান করা হয়, তাই আমি (তোমার) সম্মান করি। এ কথা বলে তিনি অগ্রসর হন আর সেই পাথরটিকে চুমু খান। " (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩০)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বর্ণনা করেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) মহানবী (সা.)-কে সেই সময় (একটি) প্রশ্ন করেন যখন কিনা তিনি তায়েফ থেকে ফিরে আসার পর জেরানায় অবস্থানরত ছিলেন, তিনি নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি অজ্ঞতার যুগে মসজিদুল হারাম-এ এক দিন এ'তেকাফ করার মানত করেছিলাম, (এ সম্পর্কে) আপনার নির্দেশ কী? তিনি (সা.) বলেন, যাও এবং এক দিনের এ'তেকাফ কর। বৈধ মানত যে যুগেই হোক না কেন তা পূর্ণ করা উচিত- এই শিক্ষা মহানবী (সা.) প্রদান করেছেন। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন, একবার আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) তাকে খুমুস বা গনিমতের এক মেয়ে প্রদান করেন। মহানবী (সা.) যখন মানুষের বন্দিদের মুক্ত করে দেন আর হযরত উমর এমর্মে তাদের আওয়াজ শুনতে পান যে আমাদেরকে মহানবী (সা.) মুক্ত করে দিয়েছেন, তখন হযরত উমর জিজ্ঞেস করেন যে, কী হয়েছে? তারা বলে, মহানবী (সা.) মানুষের বন্দিদের মুক্ত করে দিয়েছেন। তখন হযরত উমর নিজের পুত্র আবদুল্লাহকে বলেন, হে আব্দুল্লাহ্! তুমি সেই মেয়ের কাছে যাও যাকে মহানবী (সা.) দান করেছিলেন আর তাকে স্বাধীন করে দাও।(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস-৪২৯৪)

হযরত হুযায়ফা মহানবী (সা.)-এর বিশ্বস্ত সাহাবী বলে পরিগণিত ছিলেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) তাবুকের যুদ্ধের সময়ের একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) নিজ বাহন (তথা উটনী) থেকে অবতরণ করলে তাঁর ওপর ওহী অবতীর্ণ হয়। (তখন) তাঁর (সা.) বসে থাকা বাহন (তথা উটনী) দাঁড়িয়ে যায় এবং সেটি নিজ লাগাম টানতে থাকে। আমি সেটির লাগাম ধরে ফেলি এবং মহানবী (সা.) -এর কাছে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেই। এরপর আমি সেই উটনীর কাছে বসে থাকি যতক্ষণ না মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন। এরপর আমি সেই উটনীকে তাঁর কাছে নিয়ে যাই। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? আমি উত্তরে বলি, হুযায়ফা। মহানবী (সা.) বলেন, আমি তোমাকে একটি গোপন কথা বলব, তুমি কিন্তু সেটি কাউকে বলবে না। আমাকে অমুক অমুক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে আর (তখন) তিনি (সা.) মুনাফেকদের একটি দলের নাম উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধানের পর হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন কোন ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করত আর যার সম্পর্কে হযরত উমর মনে করতেন যে, সে মুনাফেক-দলের অন্তর্ভুক্ত, তখন তিনি হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর হাত ধরে জানাযার নামায পড়ার জন্য সাথে নিয়ে যেতেন। হযরত হুযায়ফা (রা.) যদি সাথে যেতেন তাহলে হযরত উ মর (রা.)ও সেই ব্যক্তির জানাযা পড়তেন। আর যদি হযরত হুযায়ফা নিজের হাত হযরত উমর (রা.) -এর হাত থেকে ছাড়িয়ে নিতেন তাহলে হযরত উমর (রা.)ও তার জানাযার নামায পড়তেন না। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৪০-৪৪১)

হযরত উমর (রা.)-এর মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী আক্ষরিক অর্থে পূর্ণ করা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন যে, "হযরত উমর (রা.) যিনি সততা ও নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এমন স্বাদ লাভ করেছেন যে, পরবর্তীতে দ্বিতীয় খলীফা হয়েছেন। মোটকথা এভাবে সকল সাহাবী পুরো সম্মান লাভ করেছেন। রোম ও পারস্য সম্রাটের ধনসম্পদ ও রাজকন্যারা তাদের হস্তগত হয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত আছে যে, একজন সাহাবী পারস্য সম্রাটের দরবারে যান। সম্রাটের ভৃত্যরা সোনা-রুপার চেয়ার বিছিয়ে দেয় আর নিজেদের জাঁকজমক প্রদর্শন করে। তিনি বলেন, আমরা এই ধনসম্পদে লালায়িত নই। আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে, পারস্য সম্রাটের হাতের বালাও আমাদের হস্তগত হবে। অতএব হযরত উমর (রা.) সেই বালা গুলো এক সাহাবীকে পরিধান করান, যেন সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, স্বর্ণ পরিধান করা পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.) পারস্য সম্রাটের হাতের বালা একজন সাহাবীকে পরিয়েছেন। যখন তিনি তা পরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তখন তাকে তিনি ভর্ৎসনা করে বলেন, মহানবী (সা.) বলেছিলেন যে, তোমার হাতে আমি পারস্য সম্রাটের হাতের বালা দেখতে পাচ্ছি। অনুরূপভাবে এক উপলক্ষ্যে পারস্য সম্রাটের মাথার মুকুট ও তার রেশমী পোশাক যখন গনিমতের মাল হিসেবে আসে, তখন হযরত উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে সেই মুকুট ও পোশাক পরার আদেশ দেন। সে যখন তা পরে নেয় তখন তিনি কেঁদে ফেলেন এবং বলেন, কিছুদিন পূর্বেও পারস্য সম্রাট এই পোশাক পরে এবং এই মুকুট পরিধান করে ইরানে স্বৈরাচারমূলক শাসন করত আর আজ সে জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। জগতের অবস্থা এমনই হয়ে থাকে। হযরত উমর (রা.) -এর এই কাজ বাহ্যিকতার পূজারীদের কাছে হয়ত সঠিক মনে হবে না, কেননা রেশম ও স্বর্ণ পরিধান করা পুরুষদের জন্য বৈধ নয়, কিন্তু একটি পুণ্য বিষয় বুঝানো আর উপদেশ দেওয়ার জন্য হযরত উমর (রা.) এক ব্যক্তিকে কয়েক মিনিটের জন্য স্বর্ণ ও রেশম পরিধান করিয়েছিলেন। মোটকথা আল্লাহ্‌র তাকওয়া-ই হলো প্রকৃত মূল জিনিস। সব নির্দেশাবলী আল্লাহ্‌র তাকওয়া সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে। আল্লাহ্‌র তাকওয়া অর্জনের জন্য কোন জিনিস, যা বাহ্যত ইবাদত মনে হয়, যদি পরিত্যাগ করতে হয় তাহলে তা-ই পুণ্যের কারণ হবে।(আনোয়ারুল উলুম, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে যে, আমি এক কূপের পাশে দাঁড়িয়ে চরকায় বাঁধা

বালতি দিয়ে পানি টেনে বের করছি। এরই মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) আসেন আর তিনি এক বা দুই বালতি পানি এমনভাবে টেনে বের করেন যে, তাঁর টানাতে দুর্বলতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ্ তাঁর দুর্বলতা ঢেকে রাখবেন এবং তাকে ক্ষমা করবেন। এরপর উমর বিন খাত্তাব (রা.) আসেন আর সেই বালতিটি এক বড় বালতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন আমি এমন শক্তিশালী কাউকে দেখি নি, যে এমন আশ্চর্যজনক কাজ করেছে যেমনটি হযরত উমর (রা.) করেছেন। (তিনি) এত পানি বের করেন যে, মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায় আর স্ব স্ব স্থানে গিয়ে বসে পড়ে।

(সহী বুখারী, কিতাবু ফাযায়েলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৮২)

হযরত ইবনে উমর বলেন, আমি মহানবী (সা .) এর কাছে শুনেছি যে, তিনি বলতেন, একদা ঘুমন্ত অবস্থায় আমার কাছে একটি দুধের পেয়ালা আনা হয় আর আমি এতটা পান করি যে, আমি এর সতেজতা বা তরলতা নিজ নখ দিয়ে নিঃসরিত হতে দেখি।

অতঃপর আমি আমার অবশিষ্ট দুধটুকু হযরত উমর বিন খাত্তাবকে প্রদান করি। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনি এর কী ব্যাখ্যা করেছেন। মহানবী (সা.) বলেন, জ্ঞান।(সহীহ আল বুখারী, কিতাবুল ইলম, হাদীস-৮২)

হযরত যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ফাযলুল ইলম' এর অর্থ এ স্থলে জ্ঞানের মাহাত্ম্য নয়, বরং জ্ঞানের অবশিষ্টাংশ। জ্ঞানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে পৃথক অধ্যায় গঠন করা হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর স্বপ্ন এবং এর ব্যাখ্যা দ্বারা; অধিকন্তু সেসব ঘটনা দ্বারা, যেগুলোর মাধ্যমে এ স্বপ্নের সত্যায়ন হয়, এটা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য যে, পার্থিব বিজয় এবং মাহাত্ম্য যা মুসলমানরা হযরত উমর (রা.)-এর মাধ্যমে অর্জন করেছে, সেটি নবুওয়্যতের জ্ঞানের অবশিষ্ট অংশ ছিল, যা হযরত উমর (রা.) মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। কুরআন মজীদে মহানবী (সা.)-কে তাঁর উক্ত পূর্ণাঙ্গীন মর্যাদার কারণে 'মাজমাউল বাহরাইন' অর্থাৎ ইহজাগতিক ও পারলৌকিক কল্যাণসংক্রান্ত জ্ঞানের সমাহার আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী রাজনীতিকে আল-ইলম এর মাঝে অন্তর্ভুক্ত করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, মহানবী (সা.) পরিপূর্ণ সত্য এনেছেন যা মানুষের দুই জগতের কল্যাণকে পরিবেষ্টন করে আছে। যেভাবে মসীহ্ (আ.) তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যখন সেই রূহুল হক (বা সত্যের রূহ) আসবেন তখন তিনি পরিপূর্ণ সত্য নিয়ে আসবেন। (যোহন, অধ্যায় ১৬, শ্লোক ১২)

হযরত উমর (রা.)-এর ঘটনাবলী অধ্যয়ন করলে এই অবশিষ্ট দুধের প্রকৃত সত্য জানা যায় যা তিনি মহানবী (সা.)-এর কল্যাণভাণ্ডার থেকে তিনি পান করেছেন।

(সহী বুখারী, উর্দু অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, শাহ ওলীউল্লাহ্ সাহেব, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫৬-১৫৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) -এর সম্মুখে একবার হযরত উমর (রা.) স্বপ্নে দুধের পেয়ালা লাভের উল্লেখ করেন। তখন তিনি (সা.) বলেন, এর অর্থ হলো 'জ্ঞান'। (খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৩, পৃ: ৪৬৭)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি (সা.) বলতেন, আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। আমি দেখলাম লোকজনকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছে আর তারা জামা পরিধান করে আছে। তাদের কয়েকজনের জামা বুক পর্যন্ত পৌঁছায় আর কয়েকজনের এর নীচ পর্যন্ত। আর উমর (রা.)-কেও আমার সামনে উপস্থিত করা হয়। তিনি জামা পরিধান করে ছিলেন, যা তিনি হেঁচড়ে চলছিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, আপনি এর কী অর্থ করেছেন? তিনি (সা.) বলেন, এর অর্থ 'ধর্ম'।

(সহীহ আল বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, হাদীস-৩৬৯১)

মহানবী (সা.) একবার বিভিন্ন সাহাবীর বিশেষত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে বলেন , আমার উম্মতে আল্লাহ্র ধর্মের ব্যাপারে সবচেয়ে দৃঢ় হলেন উমর। (সুনানে ইবনে মাজা, কিতাবুস সুন্নাহ, হাদীস-১৫৪)

হযরত মালেক বিন আগওয়াল থেকে বর্ণিত, হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার হিসাব গ্রহণের পূর্বেই আত্মপর্যালোচনা কর, কেননা এটি তুলনামূলকভাবে সহজ, অথবা বলেছেন, তোমাদের হিসাবের ক্ষেত্রে অধিক সহজ। আর তোমাকে ওজন করার পূর্বে নিজ প্রবৃত্তির ওজন কর এবং সর্বাগ্রে সবচেয়ে বড় জবাবদিহিতার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর। يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (সূরা আলহাক্কা: ১৯) অর্থাৎ, সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ্র সম্মুখে) উপস্থিত করা হবে এবং (কোন) গোপন বিষয় তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না।

(উসদুল গাবাহ ফি মারিফাতিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৬১)

হযরত হাসান (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর উল্লেখ করতেন তখন বলতেন, আল্লাহ্র কসম! যদিও তিনি প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না আর আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীদের মাঝে সর্বোত্তমও ছিলেন না, কিন্তু সংসার বিমুখতায় এবং আল্লাহ্ তা'লার আদেশের ব্যাপারে কঠোরতার ক্ষেত্রে তিনি মানুষের চেয়ে এগিয়েছিলেন। আর আল্লাহ্র বিষয়ে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় করতেন না। (মুসান্নিফ ইবনে আবি শিবা,কিতাবুল ফাযায়েল, খণ্ড-১১, পৃ: ১২০)

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! হযরত উমর বিন খাত্তাব যদিও ইসলাম গ্রহণে আমাদের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন না; কিন্তু তিনি কোন্ বিষয়ে আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা আমি উদঘাটন করেছি তিনি আমাদের মাঝে সবচেয়ে বেশি পুণ্যবান এবং জগতবিমুখ ছিলেন।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শিবা,কিতাবুল ফাযায়েল, খণ্ড-১১, পৃ: ১২১)

হিশাম বিন উরওয়া তার মায়ের বরাতে বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর (রা.) সিরিয়ায় আসেন তখন তার জামা পিছন দিক থেকে ছেড়া ছিল। সেটি এক মোটা ও সুমবুলানী (ইরানী) জামা ছিল। সুমবুলানী হলো এমন দীর্ঘ জামা যা, মাটির সাথে লেগে থাকে আর কথিত আছে এ ধরনের জামা রোমানরাও পরিধান করত। যাহোক তিনি এই জামা আযরিয়াত বা এ্যয়লাবাসীদের নিকট প্রেরণ করেন। এটিও সিরিয়ার পথে একটি শহর, আর এই এ্যয়লা সিরিয়ার নিকটবর্তী ও লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত একটি শহর। যাহোক বর্ননাকারী বলেন, সে সেই জামা ধৌত করে এবং এতে তালি লাগিয়ে দেয় এবং হযরত উমর (রা.) -এর জন্য একটি কুবতরি জামাও প্রস্তুত করায়। কুবতরি হলো তুলার তৈরী সাদা ও পাতলা কাপড়। অতঃপর সেই উভয় জামা নিয়ে সে হযরত উমর (রা.)-এর কাছে আসে এবং তার সামনে কুবতরি জামা উপস্থাপন করে। হযরত উমর সেই জামাটি নেন এবং সেটিকে ছুয়ে দেখেন আর বলেন, এটি বেশি মোলায়েম। আর সেটি সেই ব্যক্তির প্রতি ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, আমাকে আমার জামা দিয়ে দাও, কেননা সেটি সব জামার মাঝে সবচেয়ে বেশি ঘাম শোষণকারী।

(মুসান্নিফ ইবনে আবি শিবা,কিতাবুল বুয়ুস ওয়াস সিরায়া, খণ্ড-১১, পৃ: ৫৮০-৫৮১, হাদীস-৩৪৪২৭) (তাজুল উরুস)

অর্থাৎ, সেই ছেঁড়া জামা, যেটিতে তুমি তালি লাগিয়েছ সেটিই উত্তম। হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-কে সেই সময় দেখেছি যখন তিনি আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন। তখন তার জামায় কাঁধের মাঝামাঝি চামড়ার তিনটি তালি লাগানো ছিল। অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি হযরত উমর (রা.)-এর জামায় কাঁধের মাঝামাঝি চামড়ার চারটি তালি দেখেছি।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৯)

যাহোক হযরত উমর সংক্রান্ত এই বর্ণনা এখনও চলছে, ইনশাআল্লাহ্ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে। এখন আমি একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করতে চাই এবং জুমুআর নামাযের পর তার জানাজাও পড়াব, ইনশাআল্লাহ্।এই স্মৃতিচারণ ডাক্তার তাসীর মুজতবা সাহেবের, যিনি ফযলে উমর হাসপাতালের ডাক্তার ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে সত্তর বছর বয়সে তিনি মৃত্যু বরণ করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ । তার বিভিন্ন রোগ ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই তিনি অনেক বেশি অসুস্থ হয়ে পড়েন, এরপর তার অবস্থা খারাপ হয়ে যায় এবং তিনি মৃত্যু বরন করেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ।

ডাক্তার সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার পিতার কাযিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর সাহাবী সৈয়দ ফখরুল ইসলাম সাহেবের মাধ্যমে। কিন্তু ডাক্তার তাসীর মুজতবা সাহেবের পিতা গোলাম মুজতবা সাহেব তার ছাত্রজীবনে ১৯৩৮ সনে বয়আত গ্রহণ করেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস যখন নুসরত জাহাঁ স্কীমের অধীনে জীবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানান তখন ডাক্তার তাসীর সাহেবের পিতা ডাক্তার গোলাম মুজতবা সাহেব করাচীতে সিভিল সার্জন হিসেবে কার্মরত ছিলেন। উক্ত তাহরীকে সাড়া দিতে তিনি সেখান থেকে অবসর গ্রহণ করেন আর ওয়াকফ করে ১৯৭০ সালে আফ্রিকা চলে যান এবং ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সেখানে অর্থাৎ ঘানা, নাইজেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে সেবা প্রদান করেন। মেডিসিন বিষয়ে নিজের পড়াশোনা শেষে ডাক্তার তাসীর মুজতবা সাহেবও প্রায় দুই বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। অতঃপর করাচী সিভিল হাসপাতালে কাজ করেন। এরপর করাচীর জিন্নাহ্ হাসপাতালে কিছুকাল কর্মরত থাকেন। ১৯৮২ সালে তিনি তিন বছরের জন্য জীবন ওয়াকফ করলে তাকে ঘানা প্রেরণ করা হয়। সেখানে টিচিমান নামে একটি হাসপাতালে তিনি কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে তিনি কোরে হাসপাপতালে সেবা করার তৌফিক লাভ করেন, যা মূলত তার পিতাই আরম্ভ করেছিলেন। তিনি তার পিতার সাথে তিন বছর কাজ করেন আর তার কাছ থেকেই সার্জারি শিখেছেন। তিনি খুবই দক্ষ সার্জন ছিলেন। ঘানায় ডাক্তার তাসীর সাহেব প্রায় ২৩ বছর কাজ করার তৌফিক লাভ করেছেন।এরপর তিনি রাবওয়ার ফজলে উমর হাসপাতালে ১৭ বছর সেবাদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন এভাবে মোট ৪০ বছর তিনি সেবাদানের সৌভাগ্য পেয়েছেন।

সৈয়দ দাউদ মুযাফফর শাহ সাহেব এবং সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবার কন্যা আমতুর রউফ সাহেবার সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। সাহেবযাদী আমাতুল হাকীম সাহেবা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর কণ্যা ছিলেন। ডাক্তার সাহেবের এক পুত্র এবং এক কন্যাসন্তান রয়েছে। তাঁর কন্যা আমার বৌমা।

তাঁর সহধর্মিণী আমাতুর রউফ সাহেবা বলেন, অসুস্থতার সময় আমি যখন তাঁকে দেখতে গিয়েছি তখন তিনি বলেন, হুযূরকে আমার পক্ষ থেকে সালাম দিবে (অর্থাৎ আমাকে সালাম দিয়েছে) আর তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছিল যেন চিরবিদায়ের সালাম দিচ্ছেন। এরপর তিনি লেখেন, ঘানায় তিনি একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। অতি কষ্টে রাত পার করেন। খুবই ভয়াবহ অবস্থা ছিল। ফজরের সময় বললেন, কেউ সালাম দিয়েছে, দেখ তো কে? আমি বললাম, দরজা বন্ধ, কারও তো ভিতরে আসার সুযোগ নেই। এক ঘণ্টা পর তিনি পুনঃরায় বললেন, আমি সালাম দিতে শুনেছি, কেউ সালাম দিয়েছে আর এরপর থেকেই তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে এবং তিনি সুস্থ হয়ে যান। এটি ঘানার ঘটনা। তিনি বলেন, আমি তার জন্য দোয়া করি, আর আমাকে বলা হয়েছে যে, তিনি দীর্ঘায়ু লাভ করবেন। তিনি অতি বিনয়ী, নিঃস্বার্থ ও নিরীহ মানুষ ছিলেন। কখনও কারও দোষ বলে বেড়ান নি, পরচর্চা ও কারো বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন নি। অন্যকে এসব করতে দেখলে তিনি চুপ থাকতেন।

ডাক্তার সাহেবের ভাই লেখেন, আমরা দেখেছি, ছুটির পরও তিনি রোগী দেখতেন। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, অন্যান্য ডাক্তাররা যেহেতু রোগী কম

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 25 Nov-2 Dec, 2021 Issue No.47-48

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

দেখে তাই যেসব রোগী হাসপাতালে আসে তারা বিনা চিকিৎসায় ফেরত চলে যাবে–এই ভেবে আমি তাদেরকে দেখি এবং অন্যান্য ডাক্তারদের বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে নিই। খুবই ভদ্র এবং স্বল্পভাষী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। নিরাপত্তা কর্মী এবং হাসপাতালের কর্মীরা বলেন, সদা হাস্যবদনে কুশলাদী জিজ্ঞেস করে তবেই যেতেন। রোগীদের সাথে আর বিশেষত আহমদীদের সাথে তিনি অতি উত্তম ব্যবহার করতেন আর হাসপতালের সময়ের বাইরে কেউ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছে গেলে প্রায়শ তিনি ফিস না নিয়েই তাদেরকে দেখতেন। রাবওয়ার জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল মোবাশ্বের সাহেব লেখেন, বিভিন্ন সময় তাঁর সাথে আমার বসার সুযোগ হয়েছে। তিনি খুবই স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন, খুব নম্রভাবে, উদার মনে আর ভালবাসার সাথে এবং বিনীতভাবে কথা বলতেন। এমন বিনয়, নম্রতা এবং সরলপনা আমি আর কারও মাঝে দেখি নি। তিনি বলেন, আমি হাসপালের লোকদের কাছেও শুনেছি বিশেষ করে দরিদ্রদের কাছে শুনেছি আর এমন এমন ঘটনা শুনেছি যে, ঈর্ষাও হত আবার সুখানুভূতিও হত যে, হাসপাতালে এমন ডাক্তারও আছেন! তিনি আরও বলেন, (পূর্বে যেভাবে উল্লেখ করেছি) ডাক্তার সাহেব রোগী দেখতেন বরং অনেক সময় হাসপাতালের কর্মদিবস শেষ হলে ডাক্তার সাহেব উঠে বাইরে চলে এসেছেন অথবা নিজের রুম থেকে বাইরে বের হওয়ার সময় কোন রোগী এসে যেত তখন তিনি সেই রোগীকে এমনভাবে নিজের রুমে নিয়ে যেতেন যেন তিনি তারই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি দরিদ্রদের প্রতি পরম দয়াদ্র ছিলেন।

জার্মানির হিউমিনিটি ফাস্টের চেয়ারম্যান আতহার যুবায়ের সাহেব বলেন, আমি যখন ২০০৪ সালে আফ্রিকা সফরে যাই তখন আমার সাথে ডাক্তার সাহেব ঘানায় এবং অন্যান্য স্থানে আমার সফরসঙ্গী ছিলেন। তিনি বেনিনেও আমার সাথে গিয়েছিলেন। আতহার যুবায়ের সাহেব বলেন, ডাক্তার সাহেব কোন এক মহিলাকে বিচলিত দেখতে পেলেন। ডাক্তার সাহেব আমাকে বললেন, তাকে জিজ্ঞেস করুন- সমস্যা কী? সেই মহিলা বলেন, আমি খলিফাতুল মসীহ্‌র সাথে সাক্ষাত করতে এসেছি আর আমার কাছে যা-ই ছিল, আমি তা ব্যয় করে ফেলেছি, আমার কাছে ফিরে যাওয়ার পয়সা নেই। তখন ডাক্তার সাহেব বলেন: ঠিক আছে, তাকে ত্রিশ হাজার ফ্রাঙ্কসিফা (আফ্রিকার স্থানীয় মুদ্রা) দিয়ে দাও। তিনি (বর্ণনাকারী) বলেন, সেই সময়, সেই যুগে তা প্রায় একজন সাধারণ মানুষের এক মাসের উপার্জনের সমপরিমান অর্থ ছিল যা ডাক্তার সাহেব তৎক্ষণাৎ প্রদান করেন।

হানিফ মাহমুদ সাহেব-ও লিখেছেন, তিনি নিতান্তই মধ্যমপন্থা অবলম্বনকারী ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি ওয়যাকফে জিন্দেগীদের সাথে অনেক ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। একবার তার (মাহমুদ সাহেবের) স্ত্রী অসুস্থ হলে (ডাক্তার সাহেব) তার চিকিৎসা করেন বরং তিনি (অর্থাৎ মাহমুদ সাহেব) বলেন, আমরা তো কেবল পরামর্শের জন্য গিয়েছিলাম রোগী দেখাতে যাই নি। তিনি জিজ্ঞেস করেন যে টিকেট কোথায়, আমর া বললাম আমাদের টিকিট কাটা হয় নি, তিনি (অর্থাৎ ডাক্তার সাহেব) তৎক্ষণাৎ তার অধিনস্তকে ডেকে তার পকেট থেকে একশত টাকা বের করে তার বা মাহমুদ সাহেবের স্ত্রীর জন্য টিকিট কেটে আনতে দেন। আমাদের বারবার অনুরোধ করার পরও তিনি টাকা নেন নি। নিষ্পাপ চেহারায়, মানুষের বেশে মূর্তিমান একজন ফিরিশতা ছিলেন। মিতবাক ও শান্ত প্রকৃতির মানুষ ছিলেন আর মসজিদে মুবারকে নামায পড়তে আসার সময়ও নীরবে এসে দীর্ঘ নামায আদায় করতেন।

মূত্ররোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার মুজাফ্‌ফর চৌধুরী সাহেব যিনি এখানে ইউ.কে-তে থাকেন, তিনিও সেখানে ওয়াকফে আরযিতে গিয়ে থাকেন। শান্ত স্বভাবের, অত্যন্ত দয়ালু এবং সহানুভূতিশীল একজন মানুষ ছিলেন। নতুন নতুন জিনিস শেখার প্রতি (ডাক্তার সাহেবের) অনেক অগ্রহ ছিল যেন লোকদের সাহায্য করতে পারেন এবং তিনি বলেন, আমি যখন ওয়াকফে আরযিতে গিয়েছিলাম, তখন আমি তার দপ্তরে বসতাম আর তিনি নিজের চেয়ারে আমাকে বসাতেন এবং 'আপনি নিজের চেয়ারে বসুন'- তাকে এ অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি অন্য কোথাও গিয়ে বসে যেতেন।

রাবওয়ার আওয়াল তাহরীকে জাদীদ উকিলুল মাল লুকমান সাহেব বলেন, তিনি আনেক গুণের আধিকারী ছিলেন, আর্থিক কুরবানীর প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল। যখন থেকে পাকিস্তানে এসেছেন, তাহরীকে জাদীদের চাঁদা প্রতিবছর প্রথম দিকে এলানের অনতিপরেই নিজে অর্থ দপ্তরে এসে আদায় করতেন। অতপর তিনি লিখেন, পেশায় তিনি ডাক্তার হলেও সবর্দা মানবতার সেবা করাই তার অভিষ্ট লক্ষ্য বলে দৃষ্টিগোচর হত। চিকিৎসার প্রয়োজনে, এলোপ্যাথ ব্যতীত অন্যকোন চিকিৎসা অগ্রহণযোগ্য এমন নয়, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাও প্রদান করতেন।

আশোকোরে হাসপাতালের বর্তমান ইনচার্য ডাক্তার নঈম সাহেব বলেন, মিশনারী ডাক্তার হিসেবে হাসপাতালে ২১ বছর সেবা করেছেন। তিনি আরও বলেন, আজ তার মৃত্যুর সংবাদ শুনে অত্র এলাকার, অত্র অঞ্চলের গ্রাম-গঞ্জ থেকে অনেক লোক আসে, ডাক্তার সাহেবের সাথে তাদের বেশ সুসম্পর্ক ছিল, বিশেষ করে তারা সমবেদনা প্রকাশ করছিলেন এবং বলছিলেন, ডাক্তার সাহেব সরল প্রকৃতির, মিতবাক নিজের কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান, দরিদ্রের প্রতি সদয়, খুবই অতিথিপরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অনুরূপভাবে, তার জাগতিক জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি, জামা'তী বই-পুস্তক ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তাকাদি পাঠের প্রতিও গভীর আগ্রহ ছিল। অতঃপর ডাক্তার (নঈম) সাহেব লিখেন, ডাক্তার সাহেব আহমদীয়া হাসপাতাল আসোকোরেতে সার্জারীর ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অভুতপূর্ব সেবা প্রদান করেছেন যার ফলাফল আজও আমরা সেইসকল রোগীদের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছি, যারা পশ্চিম আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে এই হাসপাতাে ল চিকিৎসা সেবা ও রোগমুক্তির উদ্দেশ্যে আসে এবং নিজেদের আফ্রিকান সহজ ভাষায় 'মুজতবা' নামের উল্লেখ করেন। যদিও তার নাম ছিল তাসীর মুজতবা তথাপি ডাক্তার মুজতবা নামে সুপরিচিত ছিলেন। তার পিতাও এখানে কিছু দিন সেবাদান করেছেন। পরবর্তীতে সেই নামই প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি হাসপাতাল প্রাঙ্গনে একটি সুন্দর মসজিদও নির্মাণ করিয়ে ছিলেন।

সর্বোপরি ডাক্তার সাহেব একজন নিঃস্বার্থ এবং সৃষ্টির সেবাকারী মানুষ ছিলেন আর তার পেশাকে তিনি সেই লক্ষ্যেই কাজে লাগিয়েছেন। তার মাঝে এবং তার পিতার মাঝে এই বৈশিষ্ট্য আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছি যে, অসুস্থদের চিকিৎসা করা ছাড়াও দরিদ্র রোগীদেরকে বিনামূল্যে বিভিন্ন ঔষধের সাথে পথ্যাদির জন্য অর্থও দিতেন বরং দুধ ডিম এনে রাখতেন আর অসুস্থ রুগীদের দিয়ে বলতেন, তোমাদের দুর্বলতা দুর করার জন্য এগুলো খাওয়া আবশ্যক। ঔষধও বেশি করে দিতেন আর সাথে পথ্যও দিতেন আর বলে দিতেন যে, এগুলো খেলে তোমার স্বাস্থ্য ভাল থাকবে।

ডাক্তার গোলাম মুজতবা সাহেবও ঘানায় অনেক সেবা করেছেন কিন্তু ডাক্তার তাসির মুজতবা সাহেব এই কাজকে আরো গতিশীল করেছেন আর আমি নিজেও কতক সেইসব ঘানিয়ানদের সম্পর্কে অবগত যারা তার অনেক প্রশংসা করতেন। যাহোক, তিনি প্রকৃত ওয়াক্‌ফের প্রেরণায় সমৃদ্ধ হয়ে সেবা করেছেন আর বিশেষ করে ওয়াকেফে জিন্দেগীদের জন্যও যখনই তিনি সেখানে যেতেন, তাদেরকে বিশেষভাবে দেখতেন আর তাদের চিকিৎসা করতেন এবং নিজের ঘরে থাকার ব্যবস্থাও করতেন।হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন সফরে গিয়েছিলেন তখন তিনিও ডাক্তার সাহেবের বাড়িতেই অবস্থান করেছিলেন আর আতিথেয়তা করা তার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য ছিল।

হানিফ সাহেব লিখেন, তিনি একজন ফিরিশতাতুল্য মানুষ ছিলেন, নিঃসন্দেহে মুর্তিমান এক ফিরিশতা ছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তার প্রতি অগণিত রহমত বর্ষণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। আতিথেয়তার বিষয়ে এটিও উল্লেখ করে দিচ্ছি যে, পুরুষ তখনই আতিথেয়তা করতে পারে যখন ঘরের মহিলাও অতিথিপরায়ণ হয়। তার স্ত্রীও অনেক অতিথিপরায়ণ ও সেবা দানকারী। তার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের জন্যও দোয়া করবেন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার বয়স এবং স্বাস্থ্যে প্রভূত কল্যাণ দান করেন আর তার সন্তানদেরকেও তার পুণ্যসমূহ ধরে রাখার তৌফিক দিন আর তারা যেন তাদের মায়ের সেবাদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।

****

(১ম খুতবার শেষাংশ...)

প্রতি স্নেহশীল, খুবই সরল প্রকৃতির অধিকারী ও কঠোর পরিশ্রমী একজন মানুষ ছিলেন। সর্বদা যিকরে ইলাহীতে রত থাকতেন। মানুষের প্রতি সহানুভূতি তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, নিজেকে কষ্টের মাঝে ফেলে হলেও অন্যদের প্রশান্তির ব্যবস্থা করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুম মূ সী ছিলেন। তিনি তার অবর্তমানে তিন পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন। তার এক জামাতা কাশেফ হামীদ বাজওয়া সাহেব এখানে আমাদের পি.এস. দপ্তরে মুরব্বী হিসেবে কর্মরত আছেন। তার কন্যা আমতুল কুদ্দুস বলেন, বিনয় ও নম্রতা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত ছিল। তার পোশাক, ঘরবাড়ি, পানাহার একেবারেই সাদামাটা ছিল। সর্বদা অহংকার বর্জন করে চলতেন। দরিদ্রদের প্রতি সর্বদাই যত্নবান ছিলেন। প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও নিজের জন্য কম খরচ করতেন এবং দরিদ্রদের জন্য বেশি খরচ করতেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথেও ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার সন্তানদেরও তার পুণ্যকর্মসমূহ অব্যাহত রাখার তৌফিক দিন। (আমীন)

(১ম পাতার শেষাংশ...)

জনশ্রুতি আছে যে তাদেরকে দেখা যায় না, তারা অদৃশ্য।

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন 'হে মোমেনগণ! আমরা এজন্য রসূল প্রেরণ করেছি যাতে তোমরা তাকে সাহায্য ও সমর্থন কর এবং পৃথিবীতে তাঁর সম্মান প্রতিষ্ঠিত কর। জিনেরা যদি ঈমান এনেছিল, তবে তারা কিভাবে রসুল করীম (সা.)-এর সাহায্য করত। লোকে বলে জিনেরা মানুষের মাথায় চেপে বসে এবং নানা রকমের ফলমূল এনে দেয়। (ক্রমশ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir